গ্নু-লিনাক্স ইশকুল

জিএলটি মধ্যমগ্রাম
glt-mad@ilug-cal.org

শূন্য নম্বর দিনে আমরা একটা পিসির বাইরে থেকে ভিতর দিকে এগোলাম, এক আর দুইয়ে তার গঠন আর কাজ করার এককগুলো নিয়ে একান্ত প্রাথমিক কিছু কথা বললাম — যার প্রায় গোটাটাই বর্তমান, এই বর্তমান, কেবলই বত্রিশ বিট করিছে নির্মাণ, অথচ এখন তো আমরা প্রায় আমাদের পা ৬৪ বিটের দিকে এগোতে শুরু করেছে, পশ্চিমের বাজারে মেইনফ্রেম আর পিসি দুটো অংশেই এসে গেছে। নিশ্চয়ই এখনো বিকট কিছু একটা দাম — আমি জানার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু যে আকারে আমরা পিসিকে পাচ্ছি, আমাদের সামনে, এই আকারটা এই আকারটাই যে হয়ে উঠল, তার জ্যান্ত কিছু ক্রমানুবর্তন আছে। আজকের 'দুলকি চাল' শব্দবন্ধে যেমন অনেক আগের কোনো এক পালকি থেকে ঘোমটার বৌটির বা ঘোড়সওয়ারের চালের লুপ্ত মেটাফর, লুপ্ত মেটাফরকে লুপ্ত বলতে হচ্ছে মানেই তো সেটা লুপ্ত নয়, তার লোপপ্রক্রিয়াটাই আমার আজকের বর্তমান, তেমনি, কম্পিউটারের আজকের অবয়বের মধ্যে, সার্কিট থেকে সার্কিটে, ট্রানজিস্টর থেকে ট্রানজিস্টরে তথ্য এককের নড়ে বেড়ানোর মধ্যে সেই ক্রমানুবর্তন সমানে চলছে। মাতৃগর্ভের ওজনহীন ঝুঁঝকো কোমলতার আশ্রয়ের দুশোআশি দিনে আপনি যেমন পেরিয়ে এসেছেন গোটা হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্সের অভিযোজন পথ, অমেরুদণ্ডী, সরীসৃপ, উভচর, ঠিক সেই রকম আপনার পিসির এই গোটা কয়েক আয়তাকৃতি এবং একটা আধাবর্তুল ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে, তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের মধ্যে রয়ে গেছে এই গোটা ক্রমানুবর্তন। এই ক্রমানুবর্তনটাকে আমরা এবার ধরার চেষ্টা করব। এতে একটা বাড়তি আরামও হবে আমাদের, গত তিনটে দিনে কথা বলতে গিয়ে বারবার গ্নু-লিনাক্স আর উইনডোজ এই দুটোকেই অনেকবার পাশাপাশি আনতে হয়েছে, দুটো থেকেই সমান্তরাল উদাহরণ, অনেকটা প্রতিতুলনার মত, এর মধ্যে একটা তুমুল ঘাপলা আছে। মোট গঠন এবং সেই গঠনকে ভাবার প্রক্রিয়ার নিরিখেই, মানে অন্টলজি আর এপিস্টেমলজি দুটো মাত্রা থেকেই এই দুটো কাঠামো এত এত বেশি পৃথক। আমাদের অলৌকিক অঙ্কস্যার হরিনারায়ণবাবু, ক্লাস সেভেনে তিলকূটের গল্প দিয়ে যিনি আসলে লিমিট আর কনটিনিউয়িটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তখন বুঝতেও পারিনি, পেরেছিলাম অনেকগুলো বছর পরে, তিনি এই তুলনার অসম্ভাব্যতা বলেছিলেন, চার ইজ টু পাঁচ তো করবি, চার হাতি ইজ টু পাঁচ কাপ চা কর তো — মানে, তুলনা করা যায় শুধু বিমূর্ত সংখ্যার মধ্যে, কিন্তু, খুদা গাওয়া, গ্নু-লিনাক্স বা উইনডোজ দুজনেই তো বেজায় মূর্ত। আর এই মূর্তিমান আলাদাপনাকে কিছুতেই বোঝা যায়না এই ক্রমানুবর্তনটাকে না জেনে। আমরা এক আর দুই নম্বর দিনে বারবার বলেছি অপারেটিং সিস্টেমের কথা — কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেম চিরকালই ঠিক এই রকম ছিল না, মানে, একসময় তো অপারেটিং সিস্টেমই ছিল না। এখনকার চালু অপারেটিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলোর ঠিক এই এই বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠার মধ্যে মানুষের সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান কাজের চাপের একটা চমৎকার ইতিহাস রয়েছে — এগুলো ঠিক এরকমই হয়েছে কারণ একটু একটু করে বদলাতে থাকা কাজের প্রয়োজন আর সেই কাজ সামলে ওঠার মানুষের সামর্থ্য — দুটোই একইসঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বদলাতে থেকেছে, থাকছে। ইতিহাস মানে একদম কাজের নিরিখে কাজের প্রয়োজন আর সামর্থ — এই দুজনের একত্র ইতিহাস।

।। দিন তিন ।।

১ ।। কম্পিউটার হার্ডওয়ারের প্রাগ-ইতিহাস

আমাদের এই গ্নু-লিনাক্স ইশকুল পাঠমালার পরিকল্পিত ছকটা শুধুই বদলে যাচ্ছে। শেষ বদলটা তো ঠ্যাংজনিত। প্রথম ছকে তিন যেটা লিখেছিলাম, এই নতুন খসড়ায় এমনিতেই সেটা বদলে যেত কারণ শূন্যটা আগে ছিলনা, এখন এসেছে। আর, আগের খসড়াতেও পরে বেশ মন খুঁত খুঁত করেছে — শুধু কম্পিউটারের যান্ত্রিক ইতিহাসটাই এসেছিল, সার্কিট আর চিপ আর কার্ডের পিছনে জ্যান্ত মননের বদলের ইতিহাসটা প্রায় ধরাই ছিলনা। এবার সেটা আনতে চাইছি। প্রথমে হার্ডওয়ার স্তরে বদলের ইতিহাসটা আমরা ধরব, তারপর চিন্তাপ্রক্রিয়ার স্তরে। সফটওয়ার বলতে পারতাম, কিন্তু কম্পিউটার শাস্ত্রে সফটওয়ার কথাটার একটা বিশেষিত টেকনিকাল অর্থ আছে, সফটওয়ার-ও চিন্তাপ্রক্রিয়া, আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়াকে নিজেদের মাথা থেকে বার করে কম্পিউটারে ভরে দেওয়া, যাতে ক্যালকুলেটরের মত সবকিছুই নিজের হাতে নিজের মাথায় না করতে হয়, কিছুটা সে নিজেই করে নিতে পারে,

প্রোগ্রামিং ভাষার ব্যাকরণের ছাচে ঢালা আমাদের ওই বকলমা চিন্তাপ্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে। তাই, বরং সাইবার-মনন বলাই ভালো।

যন্ত্র আর মনন এই দুটো ইতিহাসের উপাদানগুলো মিলে যাওয়া দরকার, যাতে এর পরের স্তরে আমাদের সিস্টেম বোঝার চেষ্টাগুলো অসার না হয়ে পড়ে, কারণ, গ্নু-লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের কার্যকারণ সম্পর্কগুলো বহু জায়গাতেই গড়ে উঠেছে এই ইতিহাসটার সাপেক্ষে। আর মিশেল ফুকোর অর্ডার অফ ডিসকোর্সের সেই ঘোষণাটা তো আছেই — আসলে আমাদের প্রতিটি আলোচনাই সমালোচনা, আগের ঘটে যাওয়া আলোচনাগুলোর দুলতে থাকা লেজের পিছনে ব্যাদিত দাঁতের প্রদর্শনী। তাই পুরোনোটা আছেই, আমরা খেয়াল করি আর না-করি। আর, খেয়াল করাটা বহুসময়ই বেধড়ক জরুরি হয়ে পড়ে, একটা অপারেটিং সিস্টেমকে তার গতিবিজ্ঞানের নিরিখে ধরতে গেলে। অপারেটিং সিস্টেমটা শুধু জানা নয়, ভাবতে পারা দরকার।

আমরা শুরু করব যন্ত্রের বদলের প্রাগ-ইতিহাস দিয়ে। প্রাগ-ইতিহাস, কারণ, আমরা যাকে কম্পিউটার বলে চিনি, সেই রকম বা তার কাছাকাছি হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার সংস্থানটা আসতে শুরু করার পর থেকে আমরা তাকে দেখতে আরম্ভ করব অপারেটিং সিস্টেমের নিরিখে। মানে চার নম্বর দিন থেকে। এই জায়গাটা খেয়াল করুন, একদম গোড়ার দিকে, কম্পিউটারের অপারেশন আর অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু আলাদা হয়ে উঠতে পারেনি। একটা কাজ করা মানে ছিল গোটা আদেশটা সরাসরি কম্পিউটারকে তার একদম হার্ডওয়ারের বোধ্য রকমে গুঁজে দেওয়া। পরে, কাজের জটিলতাটা যত বাড়তে লাগল, তত আরো আরো বেশি পরিমাণে আরো আরো জটিল কাজ করার দরকার পড়ল, তখন, দেখা গেল, কাজের ক্ষেত্রটা প্রস্তুত রাখার দায়িত্ব দেওয়া দরকার পড়ল স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থাকে। কাজের এই জমিটা তৈরি রাখে অপারেটিং সিস্টেম, তাতে বীজ পোতা আর ফসল কাটার কাজ করে সফটওয়ার। ক্রমে ক্রমে আরো স্পষ্ট হবে ব্যাপারটা এই ইতিহাসের আলোচনাটা চলতে চলতে, তিনে, প্রাক-ইতিহাসে, আর চারে, জেনারেশন থেকে জেনারেশনে কম্পিউটারের ইতিহাসে।

এই জেনারেশনের ইতিহাসটা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাগাদ একই সঙ্গে পৃথিবীর চার জায়গায় ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কারের কাজ শুরু হওয়ায়। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ, মূলত যুদ্ধবাজির সরকারি তাগিদেই, প্রায় একই সঙ্গে এই ভাবনাচিন্তা শুরু হয় আমেরিকার হার্ভার্ড প্রিন্সটন পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জার্মানিতে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হাওয়ার্ড আইকেন, প্রিন্সটনে ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এ ভন নয়ম্যান, পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উইলিয়ম মশলে, এবং জার্মানির কনরাড জিউসে — এরা সবাইই এক একটা ডিজিটাল বা সংখ্যাভিত্তিক হিশেব-যন্ত্র খাড়া করেন। কিন্তু এই সময়কার এই মেশিনগুলো দেখলে আমাদের কম্পিউটারের চেয়ে কারখানা বলেই বেশি মনে হবে, আমাদের পরিচিতি পিসি-অবয়বের থেকে এরা এতটাই আলাদা। আমাদের পরিচিত ধাঁচের পিসির ধারণাটাই আসতে শুরু করেছিল, বলা যায়, ডেক বা ডিইসির পিডিপি সিরিজের সময় থেকে, তার মানে একষট্টির আগে নয়। এই পিডিপি সিরিজের মিনি-কম্পিউটারের কল্যানেই আমরা পেয়েছিলাম আজকের কম্পিউটার জগতের সবচেয়ে বড় দুটো চালিকাশক্তি ইউনিক্স এবং সি। যাকগে সে অনেক পরের কথা, এখন এসবে আমাদের দরকার নেই, আমরা এখন যেতে চাইছি কম্পিউটার যন্ত্র এবং মননের প্রাকইতিহাসে।

এই প্রাকইতিহাসের কতকগুলো বিন্দু আমাদের কাছে খুবই পরিচিত এবং সার্বজনীন, যেমন ব্যাবেজের ডিফারেন্স ইঞ্জিন বা অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন, বহু জায়গাতেই জনপ্রিয় আলোচনায় প্রায়ই দেখি এদের উল্লেখ। কিন্তু অন্য অনেকগুলো বিন্দুই তা নয়। যেমন সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা হল, ঠিক কোথা থেকে শুরু করব? প্রথমে ভেবেছিলাম, সিন্ধু সভ্যতার নিজস্ব 'হরপ্পা ফুট' এই পরিমাপ থেকে, বা তৈত্তিরিয় সংহিতা বা শতপথ ব্রাহ্মণের গণিত থেকে, বা শূল্বসূত্র, সেইজন্যে এই ঠ্যাং অ্যাকাউন্টে পড়ে-পাওয়া-আঠাশ-আনা ছুটির সাড়ে তিন আনা খরচ করলাম, নেটে একটা চমৎকার হিস্ট্রি অফ ম্যাথামেটিক্স পাওয়া যায়, নিজের পড়ার জন্যে নামিয়ে পিডিএফ করা ছিল, তারই সাইজ প্রায় আড়াই এমবি, সাইজ ছোট করতে গিয়ে সব লিংকও উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কোন সাইট তাই আর মনে নেই, যতদূর মনে হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি। সেই পিডিএফ থেকে অনেকটা পড়লাম, কিন্তু শেষ অব্দি সেখান থেকে শুরু করিনি আর, লিখতে হয়ত ভালো লাগত, কিন্তু আমাদের কাজের জন্যে জরুরি হত না। শুরু করেছি অ্যাবাকাস থেকে, আপনাদের কথা ভেবে, আপনাদের ঠ্যাং আস্ত আছে, বই পড়ার ছুটি তো পাবেন না।

আগেই বলেছি, আজকের কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার, ডিজিট মানে অঙ্কই তার ইনপুট, অঙ্কই তার আউটপুট, তাই এর ইতিহাসেরও শুরু সেই সময়টায়, অঙ্ক কাম সংখ্যাকে নাড়াচাড়া করতে করতে মানুষ যখন মনে করল, এর জন্যে একটা যন্ত্র হলে ভালো হত। অ্যাবাকাস থেকে এর শুরু। আবার, আপনি যেখানে এই লেখাটা পড়ছেন সেই পিসিটা তার আর একটা ধারা, ক্যালকুলেটর আর একটা, এরকম আরো আছে, কিছু ধারা হারিয়েও গেছে।

আমাদের ইতিহাসে প্রাচীনতম সংখ্যার উদাহরণ মূলত এসেছে মেসোপটেমিয়া থেকে। মেসোপটেমিয়ার মাটির ফলকে প্রচুর সংখ্যা এবং তাদের পাটীগণিতের উদাহরণ পাওয়া যায়। এগুলো প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের পুরোনো। এবং এদের অনেকটাই হল হিশেব এবং ট্যাক্সের অঙ্ক। এই ট্যাক্সের ব্যাপারটা সিন্ধু উপত্যকার পাথরের ফলকগুলোর বেলাতেও সত্যি। আস্কো পার্পোলা তার 'ডিসাইফারিং ইন্ডাস স্ক্রিপ্টস' বইতে যেভাবে লিখেছেন, ঠিক সবসময়ই ঠিক ট্যাক্স না হলেও টাকাপয়সার হিশেব রাখার প্রয়োজন আমাদের অঙ্কবিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্যালা। গ্রীকরা সংখ্যা লিখত অক্ষর দিয়ে, রোমানরা আরো খারাপ। ভারতীয় গণিতের অবস্থাটা ছিল এদের চেয়ে একটু বেটার জায়গায়। শূন্য নম্বর দিনে আমরা যে ডেসিমাল বা দশমিক পদ্ধতির কথা আলোচনা করলাম সেটা ভারতীয় গণিতের অবদান, দশমিক ব্যবস্থার এই অবস্থানের ম্যাজিক — একক দশক শতক সহস্র ইত্যাদি প্রত্যেকটা অবস্থানে দশের শক্তি ১ করে বেড়ে যাওয়া। এই জায়গাটায় আমরা এখনো পশ্চিমের চেয়ে এগিয়ে আছি। যেমন ধরুন তেতাল্লিশ। ইংরেজরা বলে ফর্টি থ্রি। অথচ আমরা বলি তেতাল্লিশ মানে তিন চল্লিশ। আগে একক বলছি, তার পর দশকের অঙ্ক। গণিতের দিক দিয়ে বেশি সঠিক।

ভারতীয় গণিতের আর একটা অবদান শূন্য। কিন্তু শূন্যর ইতিহাস নিয়ে অনেক জটিলতা আছে। শূন্য মানে কোনটাকে বুঝব? একটা তার আঙ্কিক মান, অন্যটা একটা অবস্থানগত চিহ্ন। শূন্য হল তাই যার কোনো মান নেই, না ধনাত্মক না ঋণাত্মক, পাঁচ থেকে পাঁচ বিয়োগ করে যা পাই — এই মানটা বুঝব? নাকি, অবস্থানের চিহ্নটাকে? মানে, ২০১৫ কে যা ২১৫ থেকে পৃথক করে সেটাও তো শূন্য। এই জটিলতা সত্ত্বেও, বোধহয়, সেই দুই অর্থেই, শূন্যটা ভারতীয় গণিতেরই অবদান। যাই হোক, ভারতীয় পারসিক রোমান গ্রীক যে বর্ণমালায় যে চিহ্নেই যে ভাবেই তাদের লেখা হোক, মানুষের জীবন ও সভ্যতা টিকে থেকেছে এই সংখ্যাদের হাতে নিয়েই। হাতে নিতে নিতে এত ভার লাগছিল যে ক্রমে ক্রমে তার সংখ্যা দেখাশুনোর একটা সহকারী রাখার কথা মনে হল। নানা দেশে নানা ভাবে এসেছে এই সহকারী। এর একটা ভালো উদাহরণ অ্যাবাকাস।
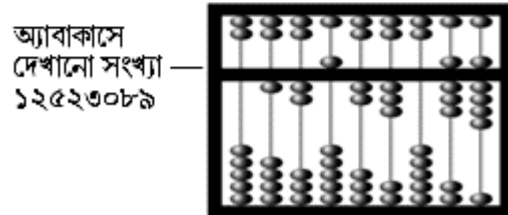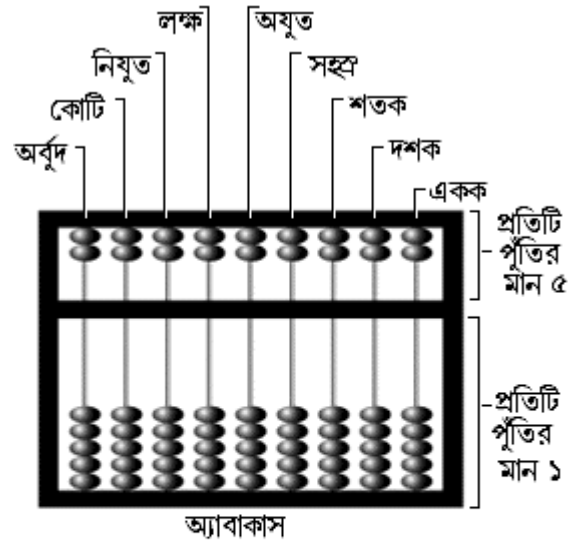
১.১।। অ্যাবাকাস

বাচ্চা বয়সে আমাদের হাতে যে স্লেট আসত, তার একটু ডিলাক্স এডিশনগুলোয় একটা করে অ্যাবাকাসও লাগানো থাকত। আমার নিজের মনে আছে, অনেকবার ভেবেছি, এটা কী করে, কিন্তু হাতের কাছে কেউই সেটা জানে এমন পাইনি। যেরকম অনেক কৌতূহলই মেটেনা আমাদের। ইন ফ্যাক্ট সঠিক ভাবে হিশেব করার প্রক্রিয়াটা আমি জানলাম এই পাঠমালাটা লিখতে শুরু করে, অ্যাবাকাস ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টায়। বেশ মজার লাগল, তাই ছবিটা দিলাম, সঙ্গে এর সরল নিয়ম কটাও। গুটি বা পুঁতিগুলো নেড়ে দেখুন, মানে, মনে মনে, বেশ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু, যোগ এবং বিয়োগের ব্যাপারে ভালো কাজ দিলেও, গুণ বা ভাগের বেলায় অ্যাবাকাস বেশ অচল। যদি সংখ্যাটা খুব বড় হয় তাহলে হিশেব করাটা রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু গুণ বা ভাগোপযোগী উপযুক্ততর খুড়োর কল আসতে তখনো অনেকটা দেরি।

যেহেতু চীন বা জাপান ছাড়া আজকে আর কোথাও বোধহয় অ্যাবাকাসের জ্যান্ত ব্যবহার নেই, সেইজন্যেই হয়ত আমাদের মাথায় অ্যাবাকাস বললেই চৈনিক শব্দটা আসে। কিন্তু তার আর পুঁতি দিয়ে বানানো এই গোনার যন্ত্রটা, নানা চেহারায়, ব্যবহার হত প্রায় সবকটা প্রাচীন সভ্যতাতেই। অ্যাবাকাস শব্দটা এসেছে গ্রীক অ্যাবাক্স থেকে, মানে গোনার বোর্ড বা চৌকো ভূমি, সেটা আবার এসেছে হিব্রু অ্যাবাক থেকে — ধুলো বা জং এইসব। ধুলোয় পড়ে থাকতে থাকতে অ্যাবাকাসে জং পড়ে যেত? এত কম হিশেব করতে লোকে? এত কম ট্যাক্স দিত লোকে? এত ভালো ছিল রাজারা?

ঠিক আজকের ক্যালকুলেটরের মতই, হিশেব করার কাজ অ্যাবাকাসে বেড়ে চলত বটে, কিন্তু, শরীর শরীর তুমি শুধুই শরীর অ্যাবাকাস, তোমার মন কই? কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা তো ছিলই না, শূন্য নম্বর দিনে ক্যালকুলেটরেরও যে সমস্যার কথা আমরা বলেছি, এমনকি ক্যালকুলেটর তো সংখ্যাগুলোকে বোঝে বিমূর্ত চিহ্ন দিয়ে, ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি, অ্যাবাকাস আরো নিরেট, সংখ্যাগুলোকেও বোঝাত কোনো বিমূর্ত চিহ্ন নয়, গুটি বা পুঁতি দিয়ে। গুটি বা পুঁতির সংখ্যাই হল হিশেবের সংখ্যা।

ছবিটায় দেখুন, যতদূর সম্ভব মধ্যযুগের একটা উডকাট ছবি, ইউরোপের। গ্রেগর রাইশের ‘মার্গারিটা ফিলোসফিকা’ বলে একটা বই থেকে। ছবিটার মধ্যে একই সাথে দুটো ঘটনা ঘটছে। বাঁ দিকে বিমূর্ত অক্ষরে সংখ্যায় হিশেব করছে একজন, আর ডানদিকে, মূর্ত রকমে, একটা বোর্ডের উপর নুড়ি পাথর দিয়ে আর একজন করছে সেই একই হিশেব। বোধহয় এইরকম জং পড়া তারের ছক কাটা ধুলোধূসর বোর্ড থেকেই অ্যাবাকাসের নামটা এসে থাকবে। ডানদিকের ব্যাপারটার সঙ্গে অ্যাবাকাসের গঠনগত মিলটা দেখুন।

ছবির মূল টেনশনটা খেয়াল করুন — বাঁদিক আর ডানদিক, সংখ্যা আর নুড়ি, বিমূর্ত আর মূর্ত। যে মানুষ কেবল অঙ্ক আর সংখ্যা চিনতে শিখেছিল তার কাছে সংখ্যাগুলো ছিল বাস্তব মূর্ত অবয়বী। এই আছে দুটো চমরী গাই, আর দুটো মারলাম, হল চারটে। সংখ্যা তখনো মূর্ততার লেজুড়। কিন্তু বিদ্যা আর বিজ্ঞান শুরু হতে হতে সংখ্যা যথেষ্ট বিমূর্ত

হয়ে পড়বে, ক্লাসিকাল ইউরোপের এই ছবি সেই গতিটাকেই দেখাচ্ছে। একটু সংখ্যা আর অঙ্ক চিনে যাওয়া মানুষ যখন ঋণাত্মক সংখ্যা আর ২-এর বর্গমূল বার করতে শুরু করবে, তখন তাতে আর মূর্ততা কই। ভেবে দেখুন, ঋণাত্মক কোনো চমরী গাই দেখেছেন কখনো? আমি অবশ্য কোনো চমরী গাই-ই কখনো দেখিনি। উদাহরণটা মাথায় এলো কারণ আমার শিশুবয়সে আদিম মানুষদের নিয়ে যে বইটা দেওয়া হয়েছিল পড়তে, তাতে তারা শুধু চমরী গাই-ই শিকার করত। অথবা, ২-এর বর্গমূলটা ধরুন, এটাকে আপনি দশমিকের পর দশ বিশ পঞ্চাশ যতদূর অব্দি চান, হিশেব করে যেতে পারেন, কিন্তু আপনার ফিতে বা স্কেল দিয়ে তার ধারেকাছে কিছুও কোনোদিন মেপে উঠতে পারবেন? এটাই হল গণিতের বিমূর্ত যাত্রার বাড়তি শক্তি। এই ছবিটা যে আমলে আঁকা তখন গোটা পৃথিবীর নানা জায়গাতেই অ্যাবাকাস একটা পরিচিত জিনিষ। ছবিটা দেখে আর একটা কারণেও আমি মজা পাচ্ছি। গণিতে কলনবিদ্যা বা ক্যালকুলাস আর আমাদের রোজকার হিশেব করা বা ক্যালকুলেট শব্দটা এসেছে ল্যাটিন ক্যালকুলাস থেকে, যার মানে ছোট পাথর। প্রথম যেদিন এটা জানলাম সেদিন বুঝেছিলাম পরশুরামের চিকিৎসা সঙ্কটে, ‘তোমার পেটে ক্যালকুলাস হয়েছে’ — এই বাক্যটার মানে কী।

মেসোপটেমিয়া বা মিশরের পাটীগণিত ইতিহাসের একটা স্তর জুড়ে আছে। এই প্রাচীন স্তরেই আছে ভারতবর্ষের ওই শূন্য তথা পরবর্তী গণিত, তারপরে কিছুটা আরো এগিয়েছিল জৈন গণিতচর্চা, বাখশালি পুঁথিতে যার নিদর্শন আছে। এরপর একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে একটা অন্ধকার যুগ চলে, যার পরে গণিতকে আমরা ফের আবিষ্কার করি, এবার ইউরোপে, ইউরোপের ইতিহাসে যেটাকে ক্লাসিকাল যুগ বলে, সেই সময়ে।

এই দুটো স্তরের মধ্যে কিছু যে হয়নি একদম তা নয়। মূলত আরব গণিতবিদরা, যতদূর সম্ভব ভারত থেকে তাদের গণিতচর্চাটা পান, টিকিয়ে রেখেছিলেন ভারতীয় বীজগণিত, পাটীগণিত এবং জ্যামিতির চর্চা। এই আরব গণিতবিদরা শুধু ভারতীয় নয়, গ্রীক গণিতের ঘরানাটাও পেয়েছিলেন। এদের একজন, মহম্মদ ইবন মুসা আল খোয়ারিজমি, লিখেছিলেন ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে একটা বই, তার নাম ‘ইলম আল-জাবর ওয়াল মুকাবলা’, রিডাকশন এবং ক্যানসেলেশন, ছোট করা এবং কেটে দেওয়ার বিজ্ঞান, যার ‘আল-জাবর’ থেকে আলজেব্রা এসেছে। এবং আজকের গণিতের তথা কম্পিউটার শাস্ত্রের ব্যাপকতম ব্যবহৃত আর একটা শব্দ এসেছে ওই লেখকের নাম থেকে — আলখোয়ারিজমি থেকে আলগোরিজমি, তার ল্যাটিন সংস্করণ থেকে এসেছে অ্যালগরিদম শব্দটা। যার খুব কাছাকাছি ‘ক্রিয়াপদ্ধতি’ ছাড়া আর কিছু এখন লিখতে গিয়ে মাথায় আসছে না। আমাদের এই পাঠমালাতেও এই ক্রিয়াপদ্ধতি বা অ্যালগরিদম বারবার আসবে।

আরব থেকে এই গণিতচর্চা খুব দ্রুত চলে গেছিল ইউরোপে। ইউরোপ তখন প্রচন্ড গতিতে তার নিজের বাইরে বেড়ে উঠতে চাইছে। খাই খাই চলছে, আহারে বসতে আরো কিছু দেরি আছে। আল-খোয়ারিজমির বই ল্যাটিনে অনুবাদ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। ঠিক যে শতাব্দীতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল কম্পাস — ভূ পর্যটন। যদিও ঠিক ভাবে স্টার্ট নিতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। মূল গতিটা শুরু হবে আরো বেশ কিছু দিন পরে, ১৪৭৭-এ, যে বছর ভারতযাত্রার টাকা তোলার আশায় ইংলন্ডে এলেন কলম্বাস। সেই একই বছরে ইউরোপে স্থাপিত হল তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় — সুইডেনের উপসালা, জার্মানির টুবিংগেন আর মেইনজ। এরও সতেরো বছর বাদে জেনোয়ার বেনে সান্তো স্তেফানো আদা আর গোলমরিচ কিনতে জাহাজে করে কালিকট আসবেন ১৪৯৪-এ। এর আগেই, ১৮৯২-এ, শুক্রবার ৩ অগাস্ট ক্রিস্টোফার কলম্বাস যাত্রা করলেন নিনা পিন্টা এবং সান্টামারিয়া এই তিন জাহাজ নিয়ে, ডাঙা দেখতে পেলেন ১২ অক্টোবর। পৃথিবী, জ্যোতির্বিদ্যা, মাপজোক — এর সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে আর একটা জিনিষ আসার কথা, নিজের মাথাতেই ভেবে দেখুন — সময়, সময়-ধারণা, এবং সময়ের নিখুঁত মাপজোক। ঠিক তাই হল, শুধু গণিত নয়, আর একটা জিনিষ নাটকীয় ভাবে বদলাচ্ছিল এই গোটা সময়টা ধরে, সেটা হল সময়, এবং তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। ১৫১১-য় জার্মানির ন্যুরেমবার্গ ক্রনিকলসে পৃথিবীর প্রথম, মিনিটের কাঁটা ছাড়া শুধু ঘন্টার কাঁটায়, ঘড়ির বিজ্ঞাপন বেরোবে। জার্মান গণিতবিদ জেমা ফ্রিসিয়াস গোটা পৃথিবীর জন্যে একই সময়-কাঠামো, মানে সঠিক অর্থে গ্লোবালাইজেন শুরু করার গ্রিনউইচ-মিন-টাইম, আন্তর্জাতিক-সময়-ধারণার ভ্রূণ রাখবেন ১৫৩০-এ। কলোনি বিপ্লব আসছে, চলো যোগ দিয়ে আসি, ইউরোপ জুড়ে তখন সাজো সাজো রব। তারও তেরো বছর বাদে, ১৫৪৩-এ, মিখোলেই কোপেরনিক নামে এক প্রুশ-পোলিশ, পৃথিবীর সবকিছুই বদলে নেওয়ার অধিকার তাদের আছে এই বিশ্বাস থেকেই ইংরেজরা তার নাম বদলে করেছিল নিকোলাস কোপার্নিকাস, লিখবেন ‘ডে রেভলিউশনিবাস অর্বিয়াম

কোয়েলেস্টিয়াম', তিনি যার এক নম্বর খসড়া 'কমেন্টারিওলাস' লিখেছিলেন ১৫০৭ থেকে ১৫১৫-র মধ্যে, যাতে প্রথম রেভলিউশন শব্দটা ব্যবহার হবে — সম্বর্তন বিবর্তন আবর্তন আদি। ১৫৫০-এ, ওই কোপারনিকাসের ছাত্র জোয়াচিম ভন লাউচেন ছাপবেন, যতদূর সম্ভব, পৃথিবীর প্রথম ত্রিকোণমিতির মানের তালিকা, ট্রিগোনোমেট্রিক টেবল, পরবর্তী কালের জ্যামিতির বিকাশকে যা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। যার বিকাশের চূড়ান্ত জায়গা দাঁড়াবে, আরো বেশ কিছু বছর পরে, কার্টেজিয়ান কো-অর্ডিনেট, দেকার্তের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, ১৬৩৭। গণিতচর্চার একটা বড় উৎসাহ এসেছিল এই উপনিবেশ বানানোর তাগিদ থেকে। নতুন জংলি দেশ খুঁজতে হবে, তার মানে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে, তার পথ, তার ম্যাপ, তার মাপ।

বেড়ে উঠেছিল সমুদ্রযাত্রা, তাই বাধ্যতামূলক ভাবেই গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যা। তার মানেই আরো আরো হিশেব। পরিমাপের পদ্ধতিগুলোও বদলাচ্ছিল। ওই ফিতেয় আর কাজ চলবেনা যাতে একটাই মাপ লেখা — ছাবিবশ, তাই গলা পেট কোমর সবই ছাবিবশ, জাতি-কাল-দেশ নির্বিশেষে সবাইকে সব-কিছুকে যা শুয়োর করে দেয়। তখনকার লোক কিছু হিশেব করতে পারত-ও বটে, হিশেব করার পেশি থাকত আলাদা। জ্যোতির্বিদ কেপলারকে ভাবুন, কুড়ি বছর একটানা শুধু হিশেবই করে গেছেন। যোগ বিয়োগ গুণ আর ভাগ করার, বর্গমূল ঘনমূল মানে স্কোয়ার বা কিউব রুট ইত্যাদি করার, এবং ক্রমে আরো আরো বড় বড় সংখ্যা দিয়ে করার, প্রয়োজনটা রোজই বাড়ছিল।

১.২।। লগারিদম ও স্লাইড রুল

এখানে একটা নাটকীয় বদল এনেছিল স্কটল্যান্ডের গণিতবিদ জন নাপিয়েরের-এর লগারিদম। এই জন নাপিয়েরের

জন নাপিয়ের

(১৫৫০-১৬১৭) গণিতটা ছিল সময় কাটানোর খেলা। নাপিয়ের নিজের প্রাথমিক এবং অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণতর কাজ বলে মনে করতেন বাইবেলের রিভিলেশন তত্ত্ব নিয়ে তার গবেষণাকে। এই কাজে তিনি যথেষ্ট সফল হয়েছেন বলেও মনে করতেন। আজ তার এই বাইবেল গবেষণাকে জানা যেতে পারে একমাত্র নাপিয়েরকে নিয়ে গবেষণা করলেই। অথচ তাঁর এই লগের গুতোয় গোটা ধরিত্রী জুড়ে গুণ হয়ে দাঁড়াল যোগ আর ভাগ মানে বিয়োগ।

আমাদের কাছে জন নাপিয়েরই বেশি পরিচিত, কিন্তু নাপিয়েরের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে, মাত্র চার বছর পরে, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে লগ-টেবিল ছাপিয়েছিলেন আর একজন সুইৎজারল্যান্ডবাসী গণিতবিদ, তার নাম জাস্টাস বিরগিয়াস (১৫৫২-১৬৩২), তাঁর লগ-টেবিল ছাপা হয় ১৬২০-তে। আমরা আজ লগকে যে চেহারায় চিনি সেই চেহারায় নিয়ে আসেন এক ইংরেজ গণিতবিদ, হেনরি ব্রিগস (১৫৬১-১৬৩০)। লগারিদম শব্দটাও তৈরি নাপিয়ের-এর। গ্রীক লোগোস — অনুপাত বা হার, এবং অ্যারিথমোস — সংখ্যা। শব্দটা আসার আগে নাপিয়ের এদের ডাকতেন কৃত্রিম সংখ্যা বলে। লগারিদম তালিকা তৈরি করতে নাপিয়ের-এর কুড়ি বছর লেগেছিল। আগেই বললাম, এটা আমাদের কাছে লগারিদম-এর পরিচিত অবয়ব নয়, আর নাপিয়েরিয়ান লগ বলে এখন যেটা চলে, নাপিয়েরের এই লগ কিন্তু সেটাও নয়।

পরবর্তী জীবনে নাপিয়ের আর একটা জিনিষ তৈরি করেছিলেন, অ্যাবাকাসের থেকে একটু উন্নত এক ধরনের ক্যালকুলেটর। মান্ধাতার বাবার মানে যুবনাশ্বের ক্যালকুলেটর বলা যায়। এর নাম 'নাপিয়েরস বোনস' মানে 'নাপিয়েরের হাড়', সেটা তৈরি হত, না না, নাপিয়েরের নয়, একটা মানুষের আর কত হাড় হয়, হাতির দাঁত বা অন্য প্রাণীর হাড় থেকে।

নাপিয়েরের হাড়

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	এক
২	৪	৬	৮	১/০	১/২	১/৪	১/৬	১/৮	দুই
৩	৬	৯	১/২	১/৫	১/৮	২/১	২/৪	২/৭	তিন
৪	৮	১/২	১/৬	২/০	২/৪	২/৮	৩/২	৩/৬	চার
৫	১/০	১/৫	২/০	২/৫	৩/০	৩/৫	৪/০	৪/৫	পাঁচ
৬	১/২	১/৮	২/৪	৩/০	৩/৬	৪/২	৪/৮	৫/৪	ছয়
৭	১/৪	২/১	২/৮	৩/৫	৪/২	৪/৯	৫/৬	৬/৩	সাত
৮	১/৬	২/৪	৩/২	৪/০	৪/৮	৫/৬	৬/৪	৭/২	আট
৯	১/৮	২/৭	৩/৬	৪/৫	৫/৪	৬/৩	৭/২	৮/১	নয়

সঙ্গের ছবিতে দেখুন, এই সেই নাপিয়েরের হাড়, যুবনাশ্বের ক্যালকুলেটর। বেশ মজার, একটু নেড়ে দেখুন। আসুন, যুবনাশ্ব এই ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে কতজন শত্রুকে প্যাঁদালেন তার হিশেব কী করে করতেন, সেটা একটু দেখি। এই দেখাটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু বেশ মজার, লিনাক্স হাউ-টু-র ভাষায়, একসেলেন্ট মিস-ইউজ অফ রিসোর্স। যান্ত্রিক ক্যালকুলেটরের বিবর্তনের ইতিহাসে ঠিক এর পরের স্তরে শিকার্ডের মেশিন আবার এই নাপিয়েরের হাড়কেই ব্যবহার করেছিল তার গঠনে। এই এক দুই তিন লেখা ডানদিকের হাড়টা, এখানে বাংলায়, লেখা হত রোমান-এ, আর সংখ্যাগুলো ল্যাটিন, মানে আমাদের অভ্যস্ত ইংরিজি অঙ্ক।

ধরুন, আমরা হিশেব করতে চাইছি, একটানা ৬২৮ দিন ধরে রোজ যুবনাশ্ব ৪২৭টা করে শত্রু সংহার করে থাকলে, মোট কত শত্রু-সংহার করেছেন। আজ, যুদ্ধ শুরুর প্রায় দুবছর বাদে, ক্লান্ত যুবনাশ্ব হিশেব করছেন, মোট কটা গারবেজ কমাতে পেরেছেন মা ধরিত্রীর বুক থেকে। তার মানে, তাকে গুণ করতে হবে ৬২৮-কে ৪২৭ দিয়ে।

আমরা তাই ৬ নম্বর ২ নম্বর আর ৮ নম্বর হাড়টা বার করে আনব, ডানদিকের স্থানচিহ্ন দেওয়া হাড়ের এক, দুই আর তিন নম্বর সারির সঙ্গে মিলিয়ে রাখব তাদের। এবার খেয়াল করুন, ৪২৭ দিয়ে গুণ করা মানে আসলে ৪ খানা একশো, ২ খানা দশ আর ৭ খানা এক দিয়ে গুণ করা। ছোটবেলায় যেভাবে একক দশক শতক দিয়ে ভাবতেন, শূন্য নম্বর দিনে আমরা যা আর একবার মকশো করে এলাম, সেই ভাবে ভাবুন।

৬	২	৮	এক
১/২	৪	১/৬	দুই
১/৮	৬	২/৪	তিন
২/৪	৮	৩/২	চার
৩/০	১/০	৪/০	পাঁচ
৩/৬	১/২	৪/৮	ছয়
৪/২	১/৪	৫/৬	সাত
৪/৮	১/৬	৬/৪	আট
৫/৪	১/৮	৭/২	নয়

আমরা শুরু করব ৭ খানা এক দিয়ে গুণ করে। সাত নম্বর সারিটা দেখুন। এর সঙ্গে মিলিয়ে কোনাকুনি আমরা ফল গুলো লিখে ফেললাম।

৬ = ৬

৫ + ৪ = ৯

১ + ২ = ৩

৪ = ৪
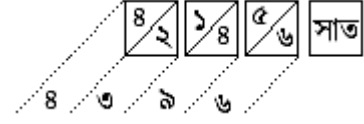
তার মানে একের সারির গুণফল ৪৩৯৬। এবার গুণ করব ওই ২ খানা দশ দিয়ে। দ্বিতীয় সারিটা দেখুন এবার। এবং একই ভাবে ফলাফলটা লিখে ফেলা যাক।

৬ = ৬

১ + ৪ = ৫

২ = ২

১ = ১
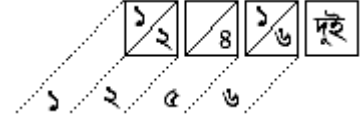
তার মানে, দশের সারির গুণফল হল ১২৫৬ গুণ দশ মানে ১২৫৬০। দশ দিয়ে গুণ করলাম কারণ এটা দশের সারি। এবার একের সারি আর দশের সারি হয়ে গেছে। বাকি আছে একশোর সারি। একই ভাবে আমরা ৪ খানা একশো দিয়ে গুণ করব। চার-নম্বর সারিটাকে দেখুন। এই বারে একটু জটিলতা আছে হাতে থাকার ব্যাপারটায়।

২ = ২

৮ + ৩ = ১ (হাতে রাখো ১)

৪ + ১ = ৫

২ = ২
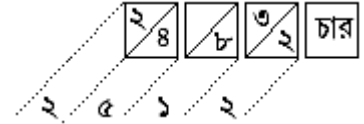
এবার এই গুণফল ২৫১২ কে একশো দিয়ে গুণ করে পাই ২৫১২০০, এটাই আমাদের এই একশোর সারির গুণফল। এবার মোট গুণফল পাব এই তিনটে সারির গুণফলকে যোগ করে।

৪৩৯৬ + ১২৫৬০ + ২৫১২০০ = ২৬৮১৫৬

এই উদাহরণের চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি এই গুণটা করা যাবে, একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলেই। যাকগে, এই হল যুবনাশ্বের ক্যালকুলেটর, নেপিয়ারের হাড়, নিজের ডিজিটাল ক্যালকুলেটরের বা কম্পিউটারের সঙ্গে একবার তুলনা করুন, তাহলেই বুঝবেন আজকের মেশিন কতটা পথ পেরিয়ে এসেছে শ পাঁচেক বছরে।

লগারিদম ল্যান্ড করে যাওয়ার পরে প্রায় চারশো বছর ধরে, ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর এবং পরে কম্পিউটার আসার আগে অব্দি গোটা পৃথিবীর মোট হিশেবনিকেশ চলেছে এই লগ টেবিলের দৌলতে। আমরাই ইশকুলে পড়াকালীন লগটেবিল কিনেছি, বইয়ের পিছনেও দেওয়া থাকত। লগটেবিল ধরে যেটা নিজে হাতে করতে হয়, সেই কাজটাই যান্ত্রিকভাবে করে দেওয়ার জন্যে এরপর এসেছিল স্লাইড রুল। স্লাইড রুল মানে দুটো পাশাপাশি লাগানো লগারিদমিক স্কেল যাতে গুণ ভাগ সহজে করে ফেলা যায় যোগ আর বিয়োগ করেই।

প্রথম সত্যিকারের স্লাইড রুল বানান ইংরেজ গণিতজ্ঞ উইলিয়াম উট্রেড(১৫৭৪-১৬৬০), ১৬২০-তে। এই উট্রেডই প্রথম গুণ এই অর্থে '×' চিহ্নটা ব্যবহার করেন। স্লাইড রুলকে বলা যায় অ্যানালগ ক্যালকুলেটর। অ্যানালগ যেখানে পরিমাপ দিয়ে হিশেব করে, ডিজিটাল করে সংখ্যা দিয়ে। ধরুন, ঘড়ির ডায়ালে মোট ৩৬০ ডিগ্রি কোণকে বারোটা ভাগে পরিমাপ করে এক একটাকে এক এক ঘন্টা দিয়ে বুঝছি, এটা অ্যানালগ। আর ওই সময়ই ডিজিট দিয়ে মানে অঙ্ক দিয়ে আসছে আমাদের ডিজিটাল হাতঘড়িতে। উট্রেড ছাড়া স্লাইড রুলের কাজ করেছেন এডমন্ড গুন্টের (১৬৮১-১৬২৫) এবং আমেডি ম্যানহেইম (১৮৩১-১৯০৬)। গুন্টের একটা দু ফুট লম্বা স্কেলের গায়ে লাগিয়ে দিয়েছিলেন একটা লগারিদমিক মানদণ্ড, যেখানে ডিভাইডর দিয়ে লগারিদমিক স্কেলের গায়ের মাপটা নিয়ে গুণফলটা

পেয়ে যাওয়া যেত। আমরা যে চেহারায় আধুনিক স্লাইড রুল দেখি, কাঁচের চিহ্নক বা কার্সর লাগানো — এই চেহারাটায় নিয়ে আসেন মানহেইম।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া অব্দি ছিল এই লগটেবিল আর স্লাইড রুলের সর্বময় শাসন। টেবিলগুলোয় কাজ হত মোটামুটি নিখুঁত, কিন্তু হত বড় আস্তে। আর স্লাইড রুলে কাজটা দ্রুত হত ঠিকই কিন্তু সব উত্তরেই একটা 'প্রায়' মানে 'অ্যাপ্রক্সিমেশন' চিহ্ন (≅) জুড়তে হত। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আসতে শুরু করেছিল নানা ধরনের ক্যালকুলেটর, যার চূড়ান্ত আকারটাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন চার্লস ব্যাবেজ। কিন্তু একটা কথা, এই ক্যালকুলেটরগুলো প্রত্যেকটাই চলত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, হাতল, গিয়ার, প্যাঁচ ঘুরিয়ে। ইলেকট্রনিক তো দূরের কথা, ইলেকট্রিকও তখনো সিনে আসেনি।

১.৩।। স্লাইড রুল থেকে ব্যাবেজ

সত্যিকারের কম্পিউটার তৈরির বাস্তব জ্যান্ত প্রক্রিয়াটা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আগে, একই সঙ্গে পৃথিবীর অনেকগুলো জায়গায়। কিন্তু তার আগে অব্দি এই ধারার চিন্তাটা কিন্তু বন্ধ ছিলনা। আমরা ওই যুগের মেশিন বলতেই চার্লস ব্যাবেজকে বুঝি, কিন্তু সেখানে ব্যাবেজ একা এবং একলা নন। তা কখনো হয়না। একটা সময় তার নিজের গতিকে চারিয়ে দেয় মানুষের চিন্তায়, আলাদা আলাদা মানুষ আলাদা আলাদা জায়গায় একই দিকের ইঙ্গিত খুঁজতে থাকেন। সকলেই যে শেষ অব্দি একই ভাবে এগোতে পারেন তা নয়। ক্যালকুলাসের ইতিহাস ভাবুন, লিবনিতজ আর নিউটন — দুজনে মোটামুটি একই সময়ে আলাদা আলাদা ভাবে একই ক্যালকুলাসের দিকে এগিয়েছিলেন। বরং নিউটনের এগোনো নিয়ে তো অনেক সিরিয়াস প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম-এর অ্যাপেন্ডিক্সে হকিং তুলেছেন। সেরকম কম্পিউটার নিয়ে ভাবনায় সকলেই ব্যাবেজের মত বেশ অনেকটা এগোতে পারেননি, কিন্তু চেষ্টা অনেকেই করেছেন, ব্যাবেজের আগে এবং পরে। তাদের অনেকের চেষ্টা প্রায় গোটাটাই নামের জগত থেকে হারিয়ে গেছে, কখনো কখনো রয়ে গেছে তাদের চারপাশের তাদের পরেকার অন্যদের ভাবনাচিন্তায়। এরকম কয়েকজনের উল্লেখ করা যাক।
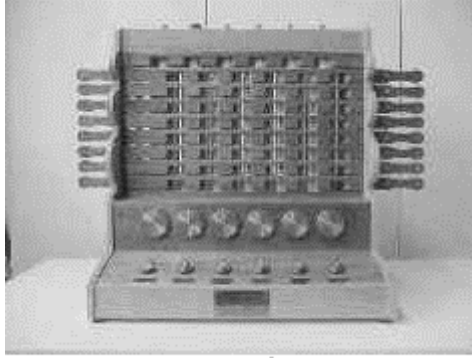
শিকার্ডের ক্যালকুলেটিং ক্লক

১৬২৩-এ, জার্মান বৈজ্ঞানিক উইলহেল্ম শিকার্ড (১৫৯২-১৬৩৫) উদ্ভাবন করেন একটা যোগ, গুণ আর ভাগ করার মেশিন। তার নাম দেন ক্যালকুলেটিং ক্লক, হিশেব ঘড়ি। এখানে ১৬২৩-এর সেই ক্যালকুলেটিং ক্লক এর পুনর্নির্মাণের একটা ছবি দিলাম আমরা। যন্ত্রটা আসলে এক সেট নেপিয়ারের হাড়, এবং নিচে একটা গুনে যাওয়ার কাউন্টার। তার মানে যতটা যন্ত্র তার চেয়ে এটাকে একটা হ্যান্ডেল লাগানো নামতা বলাই ভালো।

উইলহেল্ম শিকার্ডের এই যন্ত্রটার কথা জানা গেছে একদম আধুনিক কালে। জ্যোতির্বিদ কেপলারের কাগজপত্র পড়তে গিয়ে। তাতে কেপলারকে লেখা শিকার্ডের একটা চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিতে ছিল এই ক্যালকুলেটিং ক্লক নামের যন্ত্রটার বিবরণ আর একটা আলগা ছবি। এর পরে ১৯৫০ নাগাদ আরো কিছু নথীপত্র আবিষ্কার হয়, ক্যালকুলেটিং ক্লক সম্পর্কে আরো বহু খুঁটিনাটি জানতে পারা যায়। যা থেকে যন্ত্রটাকে ফের বানানো হয়েছিল। শিকার্ডের চিঠিতে আছে, মূল যন্ত্রটা অসমাপ্ত অবস্থাতেই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। পরে শিকার্ড আর নতুন করে কোনো ক্যালকুলেটিং ক্লক বানিয়েছিলেন কিনা তাও জানা যায়না। ১৬৩৫-এ প্লেগ রোগে মারা যান শিকার্ড।
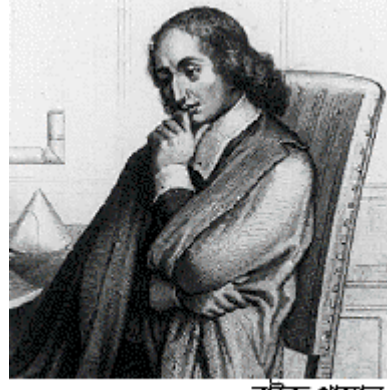
ব্লাইজ পাস্কাল

১৬৪২-এ, ফরাসি দার্শনিক কাম গণিতবিদ কাম পদার্থবিদ ব্লাইজ পাস্কাল (১৬২৩-১৬৬২) বানান একটা গণক যন্ত্র। ফ্রান্সের ক্লেরমঁ-ফেরান-এর এই বহুমুখী প্রতিভা পাস্কাল তার মাত্র ১৬ বছর বয়েসে জ্যামিতির একটা উপপাদ্য খাড়া করেন, যেটা এখনো পাস্কালস থিয়োরেম বলে পরিচিত। গণিতের তথা রাশিশাস্ত্রের তথা পদার্থবিদ্যার প্রোবাবিলিটি থিয়োরি বা সম্ভাবনা তত্ত্ব নিয়ে বড় মাপের কাজ করেন পাস্কাল। এমনকি তার কাজ ছিল আবহাওয়া বিদ্যা বা তরল পদার্থের ভৌত ধর্ম নিয়েও, পাস্কালস ল, পাত্রে আবদ্ধ একটা তরল তার সব দিকে সমান চাপ দেয়। সেই সময়টা মাথায় রাখুন, ফরাসি বৈজ্ঞানিক লাভোয়েজিয়ে যেমন গণিত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে চলে যেতেন ইতিহাসের লাইব্রেরিতে, সেখানে ক্লান্ত হলে ভূগোলে, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

পাস্কালের এই গণক যন্ত্রে বিয়োগ করা যেত। শ্যামনগরের বরদাখুড়ো যেমন আফিম খেয়ে ঝিমোতে ঝিমোতেই লেজারবুকে পেন রেখে বিড়বিড় করতেন, সাঁইত্রিশের সাত নাবে তিনে কত্তি তিন, সায়েব এসে কাঁধে চিমটি কেটে হেসে বলত, হ্যাভ এ কাপ অভ টী বাবু (কার্টসি পরশুরাম), সেইরকম পাস্কালের এই মেশিনও একটা স্তম্ভে বিয়োগ করে, আমরা যেমন পরের স্তম্ভের নিচের সারিতে এক যোগ করে নিই, পরের স্তম্ভে হাতে থাকা 'কত্তি তিন'-টা নিয়ে যেতে পারত।

এবং দেখুন, আবার সেই ট্যাক্স, ব্যাবিলন সিন্ধু থেকে পাস্কাল। পাস্কালের বাবা ছিলেন রুয়েনের ট্যাক্স কমিশনার। কাজের চাপে নাজেহাল। তরুণ পাস্কাল আসলে এই যন্ত্র বানিয়ে তার পিতৃঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। পাস্কাল কাজে হাত দেন ১৬৪২-এ, যখন তার বয়েস উনিশ। তিন বছরের মধ্যে তিনি তার মেশিন, পাস্কাল্যাঁ, 'নারী পাস্কাল', প্রথম কেজো মডেল নামিয়ে দেন। পাস্কাল্যাঁর ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যোগ এবং বিয়োগ। গুণ এবং ভাগ পাস্কাল্যাঁর আওতার বাইরে ছিল। পাস্কাল এর পেটেন্টও করেন। কিন্তু তৈরি হয়েছিল মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা। কারণ, খরচ ছিল কম না, আর কাজের বেলায় খুব একটা ভরসা করা যেত না, প্রায়ই আটকে যেত।
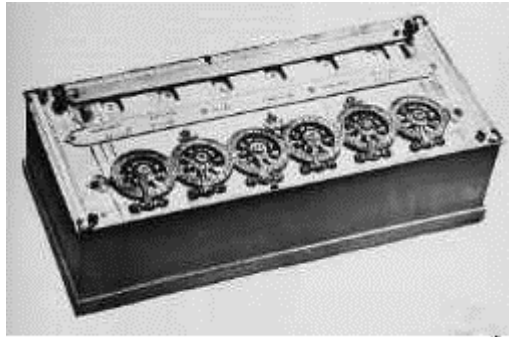
পাস্কালের পাস্কাল্যাঁ

শিকার্ডের যন্তরটার কথা জানার আগে অব্দি পাস্কালকেই ধরা হত প্রথম ক্যালকুলেটর বানিয়ে। কিন্তু তাই বলে পাস্কালের কৃতিত্ব কোথাও ছোট হয় না। এমন হতেই পারে যে পাস্কাল শিকার্ডের ওই ক্যালকুলেটিং ক্লক মেশিনের কথা জানতেনই না। এছাড়া, আমাদের দিন শূন্যর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ-এর যুক্তিমালাটা মনে করুন। যোগ মানে দুটো জিনিষকে একই জায়গায় রাখা। গুণ মানে বারবার যোগ। ভাগ মানে গুণের উল্টো — ক দিয়ে খ কে ভাগ করে

ভাগফল গ খুঁজছি মানে, আসলে এমন একটা সংখ্যা গ খুঁজছি যাকে ক দিয়ে গুণ করলে খ হয়। কিন্তু বিয়োগ এর সম্পূর্ণ বিপরীত যাত্রা। যুক্তি কাঠামো মোতাবেক সম্পূর্ণ উল্টো একটা গতি। নাম্বার সিস্টেম গড়ে ওঠার ইতিহাসেও এটা একটা বড় পদক্ষেপ। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আগে একটু নাম্বার সিস্টেম বলে এলে ভালো হত। তখন ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি। যাকগে।

ক্যালকুলাস আবিষ্কর্তা কাম বড়মাপের দার্শনিক গটফ্রিড উইলহেল্ম লিবনিতজ (১৬৪৬-১৭১৬) আবার পাস্কালের ওই পাস্কাল্যাঁ মেশিনের উপর একটা বিশেষ স্টেপড গিয়ার লাগানোর প্ল্যান করেন, যাতে সেই মেশিনে গুণ-ও করা যায়। এই করতে গিয়ে সেটা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন একটা যন্ত্র। লিবনিতজ এই যন্ত্রের নাম দেন স্টেপড রিকনার। এই স্টেপড রিকনার মেশিনে লিবনিতজ ব্যবহার করেন স্টেপড গিয়ার বা লিবনিতজ হুইল, যা পরবর্তী অনেক মেশিনেই ব্যবহৃত হয়েছে। লিবনিতজ-এর এই স্টেপড রিকনার ছিল পাস্কালের মেশিনের চেয়ে বহুগুণ জটিল। আর, আগেই বললাম, পাটীগণিতের মূল চারটে ক্রিয়া, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ — সব কটাই করতে পারত এই স্টেপড রেকনার। স্টেপড রেকনারের মেশিন ডিজাইনের মধ্যে একটা গঠনগত ত্রুটি ছিল যা ধরা পড়েছিল বহু বছর পরে।
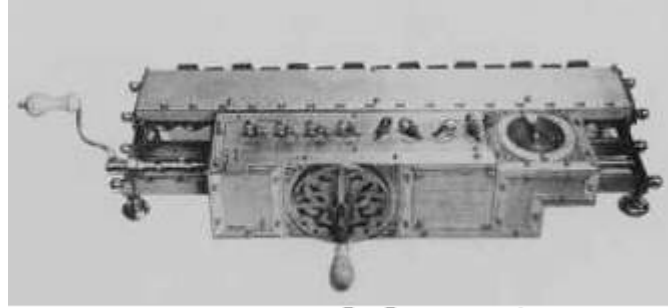
লিবনিতজ-এর স্টেপড রেকনার

প্রথম সত্যিকারের কাজেবল ক্যালকুলেটর বানিয়েছিলেন চার্লস জাভিয়ার থমাস দ কোলমার (১৭৮৫-১৮৭০) ১৮২০ সালে। যার নাম দেন অ্যারিথমোমিটার। লিবনিতজ-এর ওই স্টেপড গিয়ার পদ্ধতিকেই কাজে লাগান কোলমার। পাটীগণিতের চারটে কাজই করতে পারত। গিয়ারের চাকাটা ঘুরত সামনের দিকে। এবং সেই অবস্থায় যোগ আর গুণ করতে পারত অ্যারিথমোমিটার। গিয়ারটা উল্টে দিতে হত বিয়োগ বা ভাগ করতে হলে। এই অ্যারিথমোমিটার যন্ত্রের পেটেন্ট করা হয় ১৮২০ সালের নভেম্বর মাসে। এর থেকে একটু একটু বদলে বদলে নতুন নানা মডেলের বিক্রির তথ্য পাওয়া যায় ১৯০০ সালের পরেও। এবং এর কয়েকটি ১৯৪০ সাল অব্দিও কাজ করত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জাভিয়ার থমাস দ কোলমার সম্পর্কে আমার আর একটু কিছু জানার কৌতূহল রইল। আমার কাছে যা এনসাইক্লোপিডিয়া আছে তাতে পাইনি। নেটে আর খোঁজা সম্ভব না, এই পাঠমালার জন্যে আমার অর্থনৈতিক ধ্বস নেমে যাচ্ছে, আর বোধহয় উইদাউট পে হতে হবে এই ঠ্যাঙের ছুটিতে। আপনারা যদি কেউ কিছু পান, পাঠাবেন প্লিজ। একটা লিংক পেয়েছিলাম, গিয়ে দেখতে পারেন — http://vmoc.museophile.com।
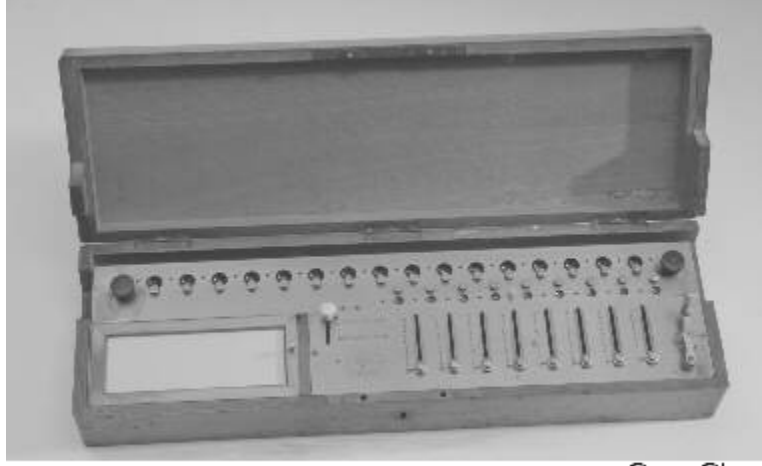
অ্যারিথমোমিটার

এইখানে আমাদের এই ১.৩ সেকশন শেষ হচ্ছে। এর পরেই ১.৪ সেকশনে আমরা যাব ব্যাবেজ-এ, তার ডিফারেন্স ইঞ্জিন এবং অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন-এ। এই সেকশনে আমরা ব্যাবেজের পূর্বসূরীদের দীর্ঘ তালিকা থেকে কয়েকটাকে জানলাম। আর একটা কথা, এখানে একটা মেশিনের আলোচনা করব কিনা তা নিয়ে আমি নিজেও সংশয়ে ছিলাম, সেটার কথা উল্লেখ করে রাখা যাক। এখানে উল্লেখিত প্রথম মেশিনের নির্মাতা শিকার্ড জন্মেছিলেন ১৫৯২-এ। বয়সে তার থেকে মাত্র একশো চল্লিশ বছরের বড় আর একজন, যেকোনো বিষয়েই প্রারম্ভিকতম কথাগুলো তিনি আগেভাগেই বলে রেখেছেন এটা যেন সভ্যতা আর সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে — লিওনার্দো দ ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), যথারীতি, তার নোটবইয়ে একটা ড্রয়িং করে রেখেছিলেন ক্যালকুলেটিং মেশিনের। সেই ড্রয়িংটা আবিষ্কৃত হয় অনেক পরে, ১৯৬৭-তে, স্পেনে। কোডেক্স মাদ্রিদ নামে পরিচিত এই প্ল্যানটা থেকে পরে একটা মেশিন বানানো হয়। মূল ড্রয়িং, পরিকল্পনা এবং তৈরি মেশিনের ছবি — গোটাটা খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু, এক, এটা সেই অর্থে লিওনার্দোর তৈরি নয়, তৈরি করা এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আর দুই, এর গোটাটাই ভীষণ ভাবে কপিরাইটের আওতায়। কপিলেফট কেন দরকার বুঝতে পারছেন? আমাদের এই জিএলটি ইশকুল পাঠমালার টেক্সটা তৈরি হচ্ছে যে কেউকে যে কোনো ভাবে প্রকাশের অধিকার দিয়ে, শুধু লেখায় কোনো পরিবর্তন আনা চলবেনা, এবং লেখার গোড়াতেই, গোটা লেখাটার ইলেকট্রনিক সংস্করণ পাওয়ার উৎস উল্লেখ করতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা আছে এটা লাগ বা ওই ধরনের কোনো ওয়েবসাইটে রাখার। সঙ্কর্ষণ আর অশেষ খুবই চেষ্টাচরিত্তির চালিয়ে যাচ্ছে এটাকে হার্ডকপিতে মানা ছাপা সংস্করণে প্রকাশ করার, যে এফএসএফ হোক আর অন্য কেউ হোক। দেখা যাক কী হয়। কপিরাইট থাকায় এখানে দিতে পারলাম না, কিন্তু ভিঞ্চির মেশিনের ভারি চমৎকার ছবি আছে নেটে। লিংকটা হল, http://www.webcom.com/calc/Calculting\ Machines.html, গিয়ে দেখুন।

১.৪।। চার্লস ব্যাবেজ এবং অঙ্কের ইঞ্জিন

হার্ডওয়ারের ইতিহাসে এর আগের সেকশনের উদাহরণগুলোর মত অনেক দেশে অনেক জায়গায় অনেক চেষ্টার মধ্যে থেকে চার্লস ব্যাবেজের (১৭৯২-১৮৭১) অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন আলাদা হয়ে দাঁড়ায় একা চার্লস ব্যাবেজের জন্যে নয়, ব্যাবেজ ছিলেন এর হার্ডওয়ার ইঞ্জিনিয়র, একজন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়রও ছিলেন, যার নাম আডা লাভলেস, তার কথায় আসছি আমরা, একটু পরে। আজকের দিনের দ্বিতীয় যে অংশটা, কম্পিউটার চিন্তনের ইতিহাস, সেখানেও আসবে এই ব্যাবেজ-লাভলেস। তৃতীয় সৌরগ্রহের মাটিতে প্রথম সত্যিকারের ডিজিটাল বা আঙ্কিক কম্পিউটার নামিয়েছিলেন ইংরেজ অঙ্কবিদ চার্লস ব্যাবেজ।

> প্রথম খসড়ায় এখানে একটা ভারি উদ্ভট ভুল ঘটেছিল, তথাগত খেয়াল করিয়ে দিয়েছে। খুবই বিদঘুটে ভুল। সালটা একই ছিল, শুধু নামটা হয়েছিল অগাস্ট ব্যাবেল। নিজেরই অবাক লাগছে, জার্মানির সোশাল ডেমোক্রাট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অগাস্ট বেবেল, বা তার লেখা, আমার রাজনৈতিক সময়গুলোয়, খুব একটা দূরবর্তী ছিলনা, কিন্তু সেটা এতদিন পর, ওই বানান পার্থক্য সমেত? প্রায় দৈনন্দিন বেখেয়ালি ভুল নিয়ে ফ্রয়েডের থিসিসের একটা টেস্টকেস।
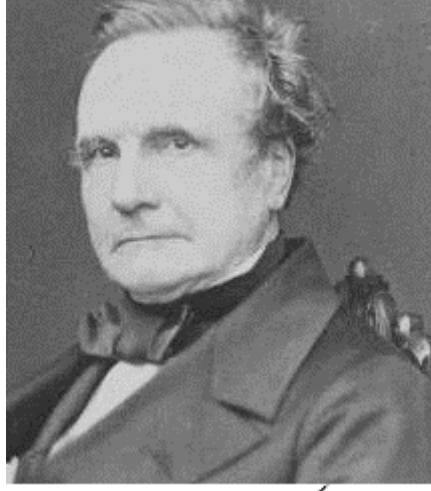
চার্লস ব্যাবেজ

ব্যাবেজের পক্ষে সবচেয়ে বড় ভুলটা হয়েছিল ভুল শতাব্দীতে জন্মানো। জীবনের শেষ দিকে তিক্ত ক্লান্ত ব্যাবেজ প্রায়ই বলতেন, জীবনে তো একটা দিনও আনন্দে কাটেনি, অবশিষ্ট জীবনটুকুর গোটাটাই দিয়ে দিতে রাজি যদি পাঁচশো বছর বাদে ভবিষ্যতের পৃথিবীতে তিনটে দিনও বাঁচার সুযোগ পাই। বড়লোক ব্যাঙ্কারের ছেলে ছিলেন চার্লস ব্যাবেজ, পড়াশুনো করেছেন ডেভনে, পরে কেমব্রিজে। যেখানে, তার মাস্টারমশাইদের চেয়ে তিনি বেশি অ্যালজেব্রা জানতেন। ১৮১২ সাল নাগাদ, বিশ বছর বয়সে, ব্যাবেজের মাথায় আসে, তারা যে লগারিদম এবং ট্রিগোনোমেট্রির টেবিল দিয়ে অঙ্ক কষেন, তার গোটাটাকে একটা যন্ত্র দিয়ে করানো যায়। সেইখান থেকে শুরু তার অসম্পূর্ণ তাই অসফল আজীবন যাত্রার।

ব্যাবেজের কালে, খুব খুচরো দুধেভাতে যোগ বিয়োগ বাদ দিলে, আর সব হিশেবের কাজই করা হত লগটেবিল দিয়ে। নাবিকরা, জমি জরিপের লোকেরা, জ্যোতির্বিদরা — সবারই হাতে থাকত পেন্সিল আর লগটেবিল, আর ত্রিকোনমিতির সাইন কস ট্যান এসবের মানের জন্যে ট্রিগোনোমেট্রিক টেবিল। এই টেবিল ছাড়া এক পা এগোনোর উপায় থাকত না। কিন্তু মজার কথা, এই টেবিলগুলো হত ভুলের ধাঁধায় ভরা।

আসলে এই লগারিদম, ট্রিগোনোমেট্রি আর অ্যাস্ট্রনমির টেবিল তৈরি-করা তখন ইংলন্ডে প্রায় একটা কুটীরশিল্প। ঘরে ঘরে লোক বসে বসে পাতার পর পাতার পর পাতা হিশেব কষে যাচ্ছে, টেবিল বানাচ্ছে। আমাদের ছোটবেলায় লোকে যেমন করে সিএ পড়ত। কার কাছে একটা শুনেছিলাম, তার গোটা ছেলেবেলাটা কেটেছে সিএ-র দুঃস্বপ্ন নিয়ে, যতক্ষণ সে জেগে থাকত, অহর্নিশি দেখত, ঠিক সামনের বাড়ির জানলায় একটা মুন্ডু ঝুঁকে রয়েছে খাতায়, সিএ পড়ছে। এটা চলেছিল তার বিএ পাশ এবং বিয়ে করা অব্দি, কারণ, তারপর সেই আশু-সিএ-সম্পন্ন পরিবার অন্য পাড়ায় চলে গেছিল বাড়ি ভাড়া নিয়ে। ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের এই গোটা সময়টা জুড়ে চার্চ বা গির্জে সমাজ জীবনে একটা বিরাট জায়গা নিয়ে বিরাজ করত, অর্থনীতির প্রতিটা স্তরে, প্রতিটা গ্রামে, প্রতিটা প্যারিশে। গাঁয়ের গির্জেতে গির্জেতে পাদ্রিদের সময় কাটানোর মানে ছিল অঙ্ক করা, অর্থাৎ, মূলত হিশেব কষা। নাপিয়ের নিজে সম্ভ্রান্ত অভিজাত ছিলেন, পাদ্রি ছিলেন না, কিন্তু তারও ব্যাপারটা ছিল এই একই।

ওদিকে ফরাসি বিপ্লবের পর ফরাসি সরকার একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা আনল। পুরোনো এককগুলো বাতিল করে দশমিক বা ডেসিমাল সিস্টেমে নিয়ে আসতে শুরু করল সমস্ত একককে। সিজিএস, সেন্টিটিটার গ্রাম সেকেন্ডের, সেকেন্ড মানে সময় ভাগটা বাদ দিলে অন্য দুটোই এই দশমিক ব্যবস্থা। তাপমাত্রা ফারেনহেইট থেকে সেন্টিগ্রেড, ওজন পাউন্ড থেকে কেজি, তরলের আয়তন গ্যালন থেকে লিটার, দূরত্ব মাইল থেকে কিলোমিটার। দশের ভাগে ভাগে। আমরা ছোটবেলায় মুখস্থ করতাম, মিলি সেন্টি ডেসি হুঁঃ ডেকা হেক্টো কিলো। হুঁঃ মানে একটা অবস্থান — এখানে গ্রাম লিটার মিটার সবই আসতে পারে। আর প্রত্যেকটা স্তর তার নিচের স্তরের দশগুণ। ডেসিমাল ব্যবস্থা।

ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছিল যে এইসময় ফ্রান্সে দশটা দাগের ডায়ালের ঘড়িও চালু হয়, আমরা যেমন বারোটা দাগের ডায়ালের ঘড়ি ব্যবহার করি। এই দশভুজ আননের ঘড়ি আজো কোনো কোনো মিউজিয়ামে আছে। কিন্তু

হিশেবের জগতে এতে ঘটলটা এই যে সমস্ত পুরোনো হিশেবের টেবিল নতুন করে কেচে গণ্ডুষ করতে হল, দশ-দিক থেকে এই দশ-মিক আক্রমণে সমস্ত পুরোনো হিশেব তো ঘেঁটে গেছে — সমস্ত পরিমাপ তো ডেসিমাল হয়ে গেছে, বদলে গেছে।

তার মানে একদম নতুন করে সব টেবিল বানাতে হবে। নতুন করে ওই তাল তাল হিশেব। এবং সেগুলো যদি যথেষ্ট সঠিক না-হয়, সমাজ-ইতিহাসের প্রতিটা স্তরেই কেরোসিন, বাজে মাপে বানানো বাজে ম্যাপের দৌলতে উপনিবেশ বানানোর দৌড়ে ইউরোপের অন্য জাতিগুলোর সঙ্গে হেরে যাওয়াটা তো ছেড়েই দিন। ফরাসি সরকারের কাছ থেকে এই নতুন টেবিল বানানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন ব্যারন দ প্রনি। প্রনি তার এই দৈত্যাকৃতি কাজকে তিনটে টুকরোয় ভেঙে নিয়েছিলেন প্রনি। এক, কিছু নামজাদা গণিতবাজ ডিসিশন নেবে ঠিক কোন কোন ফরমুলা দিয়ে কী কী করতে হবে এবং কী ভাবে। এরা হল প্রনিদলের মুণ্ড। দুই, একটা বিরাট সংখ্যক গণিতজ্ঞ এই তথ্যের মূল কাঠামোটা খাড়া করবে — এরা হল ধড়। আর তিন, আশিজন তুখোড় হিশেবী, যাদের হিউম্যান কম্পিউটার বলে, দিনরাত কষতে থাকবে সংখ্যাগুলো। প্রনির টিমের এরা হল পা, হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে প্রনির গোটা প্রোজেক্টটাকে।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের ফিল করাটাও বিতিকিচ্ছিরি রকমের শক্ত, হিশেবপরাক্রমী এই কাকেশ্বর কুচকুচদের লাইফ কতটা হেল হয়ে যেত — এই 'সামনে রইল টেবিল আর হাতে রইল পেন্সিল' প্রক্রিয়ায়। "ভাই আমি তো আমার ছেলে হওয়ার দিনে ভেবেছিলাম, নাতির অন্নপ্রাশনের মধ্যে আমার ট্রিগোনোমেট্রির টেবিলটা শেষ করতে পারব, এখন দেখছি, নাতির বিয়ের আগে হবে না, আসলে বয়েস হচ্ছে তো, স্পিড কমে যাচ্ছে রে ভাই"।

লগারিদম আর ট্রিগোনোমেট্রি আর অ্যাস্ট্রোনমির টেবিল — এদের কষে তুলতে গিয়ে এত এত মানুষের এত এত শ্রম চলে যাচ্ছিল যে শ্রম বাঁচানোর জন্যে তারা অনেক রকম কায়দাকানুন আয়ত্ত করেছিল। এর মধ্যে একটা কায়দা ছিল, কয়েকটা স্টেপ অব্দি মান হিশেব করে নিয়ে, তারপর, ওই মানগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে অন্য মানগুলো ভরে দেওয়া। এই ভরার জন্যে একটা চালু উপায় ছিল রেখা-লাগানো বা কার্ভ-ফিটিং। তারপর, ওই কার্ভ আসতে পারে যে ফাংশন থেকে, সেই ফাংশনটা অঙ্ক কষে বার করে ফেলা। এই কাজে খুব বেশি ব্যবহার হত পলিনোমিয়াল ফাংশন। একটু বাদে ডিফারেন্স ইঞ্জিনের কাজের আলোচনায় পলিনোমিয়াল ফাংশনে আসছি আমরা।

এবার ওই কার্ভের উপর ফিট করা পলিনোমিয়ালটার পরপর ভ্যালু বার করে যাও। এবং, সাবধানের মার নেই, মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় হিশেব করে দেখো, সেটা মিলছে কিনা, বা, কতটা মিলছে। যদি একান্তই না-মেলে, কুছ পরোয়া নেই। কোন একজন বিখ্যাত ডুবুরি বলেছিলেন না, একই নদীতে আমরা দুবার ডুব দিতে পারিনা। একটা পলিনোমিয়াল মিলল না, এ আর এমন কি, আর একটা পলিনোমিয়াল আর একবার কষে নাও। কষে দেখো, নতুন কোন পলিনোমিয়াল কার্ভটার কাছাকাছি আসছে। নতুন কষা পলিনোমিয়ালটা এবার কার্ভের নতুন ফিটিং। এতে সংখ্যার দেবতার খেরোর খাতায় একটু পাপ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পাপ আর পুণ্যের পার্থক্য তো দশমিকের পরের কয়েক ঘর অব্দি। সেই অব্দি মিলে গেলে, পাপ আর পুণ্য দুই-ই পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় রে ভাই। কাইন্ডলি দেখো, দশমিকের পরে ওইটুকু অব্দি যেন মেলে। দশমিকের পরে মোটামুটি কয়েক ঘর অব্দি একটা গাণিতিক মান মোটামুটি ঠিকঠাক এসে গেলে, তারপর আমাদের আর কাজের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। রাশিশাস্ত্রে বা স্ট্যাটিস্টিক্সে নিউমেরিকাল অ্যানালিসিস বা সংখ্যা ভিত্তিক কাজের ধারাটাও অনেকটাই এই। এবার, একবার পলিনোমিয়াল ফাংশনটা পেয়ে গেলাম মানে, তারপরে সেটাকে ডিফারেন্স মেথড বা পার্থক্য পদ্ধতি দিয়ে পরপর কষে যাওয়া। ডিফারেন্স মেথডের কথায় আমরা এখুনি আসছি।

ও, একটা কথা, এই পলিনোমিয়াল ফাংশন দিয়ে যে কোনো লগারিদমিক বা ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনকে যথেষ্ট সঠিকভাবে অ্যাপ্রক্সিমেট করা যায়, বা মেলানো যায় ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ আমরা ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন আর লগারিদমিক ফাংশনের কার্ভকে ট্রিগোনোমেট্রিক আর লগারিদমিক ফাংশন দিয়ে না-কষে পলিনোমিয়াল ফাংশন দিয়ে কষছি কেন? কারণ, পলিনোমিয়াল মানে একটা বীজগাণিতিক সমীকরণ, যাকে সমাধান করা যায়, কষে ফেলা যায়, তুলনামূলক ভাবে অনেক সহজেই। যা ট্রিগোনোমেট্রিক বা এক্সপোনেনশিয়াল বা লগারিদমিক সমীকরণের বেলায় একেবারেই সত্যি নয়। সেগুলো প্রায়ই হয় রীতিমত হাতা — দেখলেই জ্বর এসে যায়, কষা তো দূরের কথা।

প্রনির টিমের এই হিউম্যান কম্পিউটারদের কাজ ছিল মূলত মূলত বিদ্যুৎবেগে ঘচাঘচ করে গাবদা গাবদা যোগ আর বিয়োগ কষে যাওয়া। এরা এসেছিল বিভিন্ন ধরনের জীবিকা থেকে। কিছুদিন আগেই, ফরাসি বিপ্লবের আগে আগেই, হয়ত কোনো নবাবের, মানে ফরাসিদের তো নবাব হয়না, কোনো কঁত ভিসকঁত মারকুইর চুল ছাঁটত ফ্যাশানেবল করে এমন লোকও ছিল প্রনির বাহিনীতে। এদের শুধু যোগ আর বিয়োগ দ্রুতবেগে কষতে পারলেই হত, কারণ এরা কাজ করত মেথড অফ ডিফারেন্স বা পার্থক্যের পদ্ধতি দিয়ে।

এই হিউম্যান কম্পিউটারদের হয়ে ডিফারেন্স পদ্ধতির এই গোটা কাজটা মেশিন দিয়ে করে ফেলার পরিকল্পনা করেছিলেন ব্যাবেজ, সেই জন্যেই পরিকল্পিত মেশিনের নাম দিয়েছিলেন ‘ডিফারেন্স ইঞ্জিন’। আমরা এখানে ১৮৩২-এর ডিফারেন্স ইঞ্জিনের একটা অংশের ছবি দিয়েছি, তাও এটা প্রথম নির্মাণের, ব্যাবেজ এটা তৈরি করে গেছেন, বারবার, টুকরোয় টুকরোয়। কতটুকু তিনি করতে পারছেন, তার গোটাটার কী সাফল্য — কী প্রভাব ফেলবে সেটা কম্পিউটারের তথা বিজ্ঞানের সামগ্রিক ইতিহাসে সেটাও জেনে বুঝে উঠতে পারেননি ব্যাবেজ। অনেক উপর থেকে বিমান দিয়ে ছাড়া যেমন যেমন চীনের পাঁচিল দেখা বা বোঝা যায়না। বা, পেরুতে ইংকাদের আঁকা ওই কয়েক কিলোমিটারের ধনুর্বীর যেমন। আজকে যে আমরা ব্যাবেজের কাজের লাভলেসের কাজের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করব যে সেটা ব্যাবেজ নিজেও জানতেন না। জানতেন না যে ভবিষ্যতের এই পৃথিবীতে তিনদিনের চেয়ে অনেক বেশিদিন আরামসে বেঁচে থাকবেন। ব্যাবেজ বিপুলভাবে রয়েছেন, টেক্সটে টেক্সটে মেশিনে মেশিনে ছড়িয়ে, শ দুয়েক বছরের পরের এই পৃথিবীতে।

ডিফারেন্স ইঞ্জিন
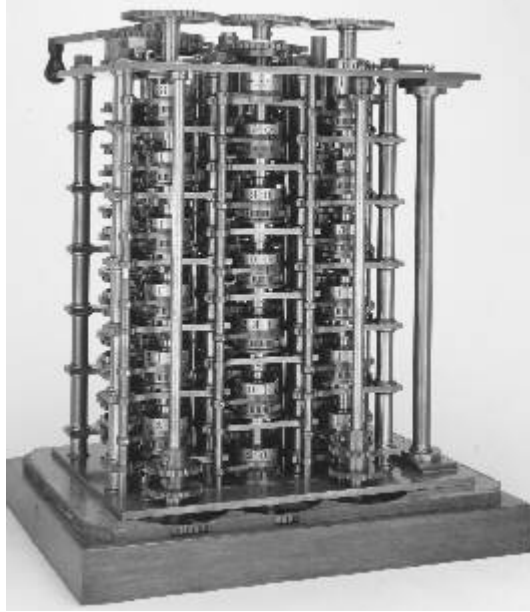
ডিফারেন্স ইঞ্জিনের কাজের এলাকাটা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরুন আমরা একটা পলিনোমিয়ালের মান জানতে চাইছি। পলিনোমিয়াল বলতে আমরা বুঝি একাধিক খণ্ডের সমষ্টি একটা গাণিতিক চিহ্নমালাকে, যেখানে প্রতিটা খণ্ডের মধ্যে থাকে একটা চলরাশি, ধরুন ক, তার কোনো একটা পাওয়ারে বা সূচকে, ধরুন ২ বা ৩ বা ৪ ইত্যাদি। আর এই প্রত্যেকটা ক বা ক-এর পাওয়ারের সঙ্গে থাকে একটা গুণক মানে স্থির সংখ্যা। যেমন ধরুন এই পলিনোমিয়ালটা —

$$ক + ২ক^{২} + ৩ক^{৩}$$

এর মানটা আমরা জানতে চাই, ক-এর অনেক অনেক মানের জন্যে, ধরুন ক = ১, ক = ২, ক = ৩, . . ., ইত্যাদি। এটাকে আমরা পুরোটা গুণ করে করে বার করতেই পারি। কিন্তু সেটা অনেক পরিশ্রমসাধ্য। ধরুন ক = ৭ এই অবস্থায় আমি যদি পলিনোমিয়ালটার মান পেতে চাই, আমাকে এই গোটাটা হিশেব করতে হবে —

$$৭ + (২ \times ৭ \times ৭) + (৩ \times ৭ \times ৭ \times ৭)$$

প্রত্যেকবার, ক-এর প্রতিটি আলাদা আলাদা মানের জন্যে এই গোটা হিশেবটা কষাই এর একমাত্র ব্যথা নয়। এর সঙ্গে আরো বড় ঝামেলাটা হতে পারে এই যে, ক-এর যে মানের জন্যে হিশেবটা কষতে চাইছি, সেটা একটা বিতিকিচ্ছিরি রকমের বড় সাইজের সংখ্যা, কয়েক টনের। ধরুন, সাত না হয়ে সাত লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশো সাতাত্তর। মেথড অফ ডিফারেন্স বা পার্থক্যের পদ্ধতি দিয়ে এই গোটাটাই করে ফেলা যায় নিছক যোগ আর বিয়োগ করে। নিচের তালিকাটা দেখুন, এখানে আমরা ক-এর মান ১ থেকে ৫ অব্দি আমাদের ওই পলিনোমিয়ালটার মান বার করেছি — $ক + ২ক^{২} + ৩ক^{৩}$

ক	$ক + ২ক^{২} + ৩ক^{৩}$	১ম পার্থক্য	২য় পার্থক্য	৩য় পার্থক্য
১	৬	—	—	—
২	৩৪	২৮	—	—
৩	১০২	৬৮	৪০	—
৪	২২৮	১২৬	৫৮	১৮
৫	৪৩০	২০২	৭৬	১৮

এখানে প্রথম পার্থক্যটা হল পলিনোমিয়াল ফাংশনটার পরপর দুটো মানের ভিতরকার অন্তর বা দূরত্বটা। যেমন ২৮ হল ৬ আর ৩৪-এর ভিতরকার দূরত্ব, ৬৮ হল ১০২ আর ৩৪-এর ভিতরকার দূরত্ব, ১২৬ হল ২২৮ আর ১০২-এর দূরত্ব, ইত্যাদি, পরপর করে যান। দেখুন, আমরা এখানে দূরত্ব হিশেবে বলছি, তার মানে ফাংশনটা যদি ক্রমশ কমতে থাকে তাহলে পরেরটা আগেরটার চেয়ে ছোট হবে, তার মানে এখানে যেমন ৩৪ থেকে ৬ বাদ দিয়ে একটা ধনাত্মক সংখ্যা পেয়েছি, সেরকম আর পাব না, তখন বিয়োগ করে পাব ঋণাত্মক সংখ্যা। ধনাত্মক না ঋণাত্মক তাতে কিছু এসে যায় না, আমরা শুধু তার মানটা নেব, গণিতে যাকে বলি মডুলাস বা অ্যাবসলিউট বা চূড়ান্ত মান। দ্বিতীয় পার্থক্য মানে প্রথম পার্থক্যগুলোর ভিতরকার দূরত্ব। যেমন ৬৮ আর ২৮-এর দূরত্ব হল ৪০। ১২৬ আর ৬৮-র দূরত্ব হল ৫৮। ২০২ আর ১২৬-এর দূরত্ব ৭৬। আবার তৃতীয় পার্থক্য হল দ্বিতীয় পার্থক্যদের পার্থক্য, ৫৮ আর ৪০-র পার্থক্য হল ১৮, আবার ৭৬ আর ৫৮-র পার্থক্য ১৮। এখানে এসে প্রথম এই মিলটা তৈরি হল, এর আগে অব্দি যে কোনো একটা পার্থক্যের সিরিজে পরপর মানগুলো হচ্ছিল আলাদা, এখানে এসে পরপর মানগুলো সমান পেলাম। কেন হল এরকম, ভেবে দেখুন তো, কেন তিন নম্বর পার্থক্যে এসেই পেলাম আমরা সবগুলোকে সমান? এখানে ক-এর সর্বোচ্চ সূচক তিন না হয়ে চার হলে কত নম্বর পার্থক্যে গিয়ে সিরিজটা পরপর একই সংখ্যার পেতাম বলে মনে হয়?

এবার তালিকায় দেখুন ক = ৪ আর ক = ৫ এই দুটোর জন্যেই তৃতীয় পার্থক্য এসেছে ১৮। দম থাকলে করে যান, দেখবেন এরপরেকার ক-এর যাবতীয় মানের জন্যেই এই পার্থক্যটা আসবে এই ১৮। এই চূড়ান্ত পার্থক্যটার মান এই দুঃসহ ১৮ না হয়ে বিনীত বিয়াল্লিশ বা প্রমিজিং পাঁচ হলনা কেন সেই দোষ আমাদের না দিয়ে দিন ওই ব্যাটা পলিনোমিয়ালকে। অন্য আর একটা পলিনোমিয়াল ফাংশনে অন্য একটা মান পাব এই তৃতীয় তথা অপ্রশ্নেয় পার্থক্যের। এই অনড় পার্থক্যটার মান পেয়ে গেলাম মানেই এক অর্থে কেল্লা ফতে। এবার এটা যে কোনো দ্বিতীয় পার্থক্যে যোগ করে দিলেই পাব তার পরের দ্বিতীয় পার্থক্যটা। এবার সেই দ্বিতীয় পার্থক্যটা সেই সারির প্রথম পার্থক্যের সঙ্গে যোগ করে দিলেই পাব পরবর্তী প্রথম পার্থক্য। এই ভাবে পলিনোমিয়ালটার পরবর্তী মানগুলো, ক-এর পরের পরের মানের জন্যে, পেয়ে যেতে পারব।

৩য় পার্থক্য	২য় পার্থক্য	১ম পার্থক্য	$ক + ২ক^{২} + ৩ক^{৩}$	ক
১৮	৭৬	২০২	৪৩০	৫
—	+ ১৮	+ ৯৪	+ ২৯৬	—
—	= ৯৪	= ২৯৬	= ৭২৬	৬

তাই, শেষ দ্বিতীয় পার্থক্য ৭৬ এর সঙ্গে ১৮ যোগ করে পাচ্ছি ৯৪, এর পরের দ্বিতীয় পার্থক্য। ৯৪ এর সঙ্গে শেষ প্রথম পার্থক্য ২০২ যোগ করে পাচ্ছি ২৯৬, পরের প্রথম পার্থক্য। এবার এই ২৯৬ যদি ক = ৫ এর জন্যে পলিনোমিয়ালের যে মান, মানে ৪৩০, তার সঙ্গে যোগ করে দিই, আমরা পাই ক = ৬ এর জন্যে পলিনোমিয়ালটার মান। এই ভাবে পর পর ক = ৭, ৮, ৯ . . . আমরা পর পর পেয়ে যেতে পারি পলিনোমিয়ালটার মান। একেই বলে পার্থক্যের পদ্ধতি বা মেথড অফ ডিফারেন্স। এখন দেখুন আর পলিনোমিয়ালটার মান পেতে আমাদের ওই অমানুষিক হিশেব আর করতে হচ্ছেনা। গুণের বৈগুণ্য থেকে ক্লিয়ারকাট ফঙবেনে যোগব্যায়াম, তাতেই ওইসব দুর্ধর্ষ ফিগার।

এই সেই ডিফারেন্স মেথড যা দিয়ে কাজ করে ডিফারেন্স ইঞ্জিন। ধরুন ব্যাবেজের ওই ইঞ্জিনের একজন অপারেটর রয়েছে, সে চাকাগুলোকে সেট করে দিল ১৮, ৭৬, ২০২, এবং ৪৩০-এ। এবার প্রয়োজনীয় হাতল ঘুরিয়ে দিল। ইঞ্জিন এবার পর পর সারিবদ্ধ যোগগুলো করে চলবে নিজে নিজেই। এবং একটু বাদেই দিয়ে দেবে চূড়ান্ত সমাধান — ক = ৬ এর জন্যে পলিনোমিয়ালের মান ৭২৬। ভেবে দেখুন, একটু আগে অব্দি একটা চাকায় গিয়ারে চলা ক্যালকুলেটর ব্যাপারটাকে যতটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল, এখন আর লাগছে?

ব্যাবেজের কাছে মূল আগ্রহ ছিল ভুল দূর করা। সচরাচর এই হিউম্যান কম্পিউটারদের করা টেবিলগুলোয় মূলত তিন ধরনের ভুল থাকত।

এক, হিশেবের ভুল, যা ইঞ্জিনের কখনো হবেনা।

দুই, হিশেব করে পাওয়া ফলাফল টুকতে ভুল করা, এটাও ইঞ্জিনের বেলায় হওয়ার নয়।

তিন, এই ভুলটায় ইঞ্জিনের কিছু করার নেই, তৈরি হয়ে যাওয়া তালিকা ছাপার সময় অক্ষর বসাতে আর প্রুফ দেখতে ভুল হওয়া। এটারও একটা সমাধান ভেবেছিলেন ব্যাবেজ। সরাসরি যদি ইঞ্জিন একটা পাতার পুরো ছকটা তৈরি করে দেয়, তার থেকে তার ব্লক করে ছাপিয়ে ফেলা যাবে। এক্ষেত্রে তিন নম্বর ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটাও থাকবে না।

ব্যাবেজ প্রথমে ডিফারেন্স ইঞ্জিনের একটা ছোট মাপের মডেল বানিয়েছিলেন, যাতে এর কাজ করার ব্যাকরণটা বোঝা যায়। ১৮২৩-এ ব্যাবেজ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১৫০০ পাউন্ডের একটা গ্রান্ট পান, তখন ব্যাবেজের প্ল্যান ছিল এমন একটা মেশিন বানানো যা ছ-নম্বর মানে সিক্সথ ডিফারেন্স অব্দি হিশেব করতে পারবে, এবং কাজ করতে পারবে কুড়িটা অব্দি অঙ্ক নিয়ে। তার সময়ের টেকনোলজির পক্ষে এবং তার খরচের পরিমাণের পক্ষে এটা ছিল বড্ড বেশি একটা চাহিদা।

সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবেজ সরকারের কাছ থেকে আরো আরো গ্রান্ট পেয়েছেন, এবং নিজের সম্পদেরও একটা বড় অংশ চলে গেছে এই ইঞ্জিনের বয়লারে। ১৮৩৩-এ ব্যাবেজের সঙ্গে তার যন্ত্রনির্মাতা জোসেফ ক্লিমেন্টের গন্ডগোল বাধে এবং ক্লিমেন্ট কাজ ছেড়ে চলে যান। রগচটা ক্রোধের জন্যে আজীবন স্বনামধন্য ছিলেন ব্যাবেজ। এই ডিফারেন্স ইঞ্জিনের কাজ চলতে চলতেই ব্যাবেজের মাথায় আসে সেই উজ্জ্বল আইডিয়া, আজকের ডিজিটাল কম্পিউটারের যা পূর্বসূরী — অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন। ব্যাবেজ তার অবশিষ্ট জীবন যৌবন ধন মান ব্যয় করে ফেলেছিলেন এই অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন বানানোর অধরা স্বপ্নে।

একবার মাথায় অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের স্বপ্ন আসা মাত্রই এই নতুন ইঞ্জিনে আক্রান্ত ব্যাবেজ এবার প্রায় বিস্মৃত হলেন দুয়োরাণী ডিফারেন্স ইঞ্জিনকে। টেবিল মেবিল বানানোর ওসব তুশ্চু কথা কার মনে থাকে — অমরত্বের দিকচক্রবালে তখন ডাক পড়েছে, টেবিলে ছাই হবে কী। আর অ্যানালিটিকাল হল সেই দশদিকে আমন্ত্রণ পাঠানো চোরাবালির মত, ঘোড়সওয়ার যার অঙ্গে অঙ্গীকার দেয়নি কোনোদিন। ব্যাবেজের জীবৎকালে ব্যাবেজ একে কার্যরত দেখে যেতে পারেননি, আর আডা তো নয়ই। এই অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন কিন্তু কখনোই ডিফারেন্স ইঞ্জিনের পরের স্টেপ বা পরের মডেল ছিলনা। ছিল একদম ভিন্ন সম্পূর্ণ অন্য মাপের একটা ধারণা। ডিফারেন্স ইঞ্জিন ছিল মূলত একটা যোগ করার কল, যে কিছু বিশেষ দক্ষ এবং দ্রুত প্রকারে তার এই যোগ-বিয়োগের কাজ করতে পারে। খুবই সৃষ্টিশীল, কিন্তু বৈপ্লবিক নয় কখনোই। অ্যানালিটিকাল একদম আলাদা রাস্তা। এটা ঠিক যে, ডিফারেন্সে কাজ করতে করতেই ব্যাবেজ অ্যানালিটিকালে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু কখনোই শুধু একটা যৌক্তিক যাত্রায় একটা থেকে অন্যটায় পৌঁছনো যায়না, চিন্তার স্তরে একটা সম্পূর্ণ উত্তরণ প্রয়োজন হয়।
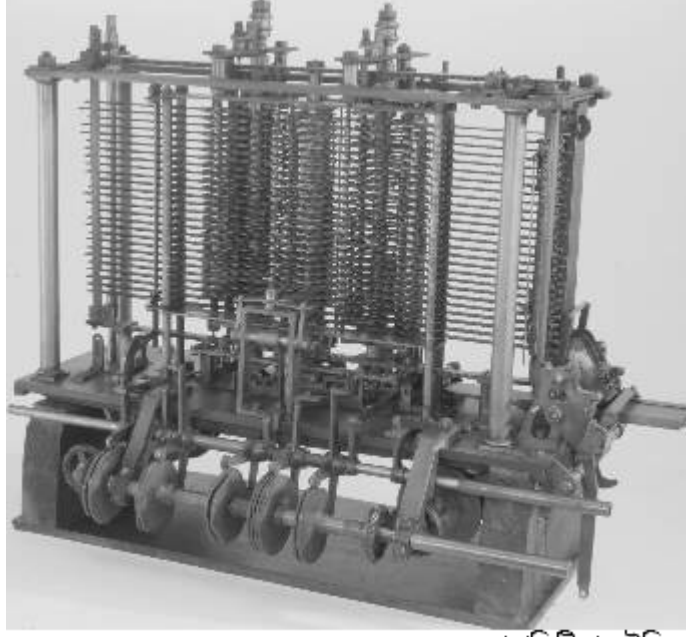
অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন

তার ডিফারেন্স ইঞ্জিনের খিঁচগুলো সবচেয়ে ভালো করে জানতেন ব্যাবেজ নিজেই। ধরুন, এই ইঞ্জিন একটা কার্ভ বেয়ে, পলিনোমিয়ালের একটা নির্দিষ্ট গঠন মোতাবেক ভ্যালু বার করেই চলেছে, করেই চলেছে, কার্ভের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। এবার, চলতে চলতে, কোনও এক সময় এই পলিনোমিয়াল মূল রেখা থেকে দূরে চলে যেতে শুরু করল। কিন্তু এবার কী করে বাধ্য করা যাবে ইঞ্জিনকে তার মূল যাত্রাপথে মানে ওই কার্ভে ফেরত যেতে? কী করে ইঞ্জিনকে বাধ্য করা যাবে নিজের কাজের ধারাটাকে বদলে নিতে? বদলাতে তো হবেই, কারণ, কার্ভের ওই নতুন রকমের অংশকে ব্যাখ্যা করতে লাগবে পলিনোমিয়ালের একটা নতুন গঠন। কিন্তু তার মানে মেশিনকে থামতে হবে, মেশিনের চাকাগুলো ফের নতুন করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, নতুন পলিনোমিয়ালের মান অনুযায়ী। তাহলে আবার ফের নতুন-করে সেট-করা মেশিনের নতুন পলিনোমিয়াল সঠিক কার্ভ বেয়েই চলবে, যতক্ষণ না আবার একটা নতুনতর পার্থক্য গজিয়ে ওঠে কার্ভ আর পলিনোমিয়ালের ভিতর। তার মানে আবার একবার নতুন করে অ্যাডজাস্ট করো। এই ভাবে চলতেই থাকবে। এই নিরন্তর পুর্নমূল্যায়নের ঘাপলাটা চটিয়ে দিচ্ছিল ব্যাবেজকে। এক, কোথাও একটা নিজের মেশিনকে, বোধহয় তথা নিজেকেই, নড়বড়ে লাগছিল তার। তার মেশিন যেন পুরোপুরি নিজের কাজ করে উঠতে পারছে না, বারবার সাহায্যের দরকার পড়ছে। আর দুই, এই ফিরে চাওয়া কেন ফিরে ফিরে চাওয়া থেকে গজিয়ে উঠতে পারে নতুন অনেকতর অনাবশ্যক ত্রুটি। অ্যাডজাস্ট তো করবে মানুষ, তার মানে আবার একটা নতুন করে ভুলের উৎস, প্রাথমিক ভাবে যে ভুলের রাজত্ব থেকে সরে আসার উদ্দেশ্যেই এই ইঞ্জিনদের প্ল্যান।

১৮৩৪ থেকে ১৮৩৬ অব্দি ব্যাবেজ বারবার করে নতুন করে তার অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের ডিজাইন বদলাতেই থাকলেন। আর এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে, ব্যাবেজ, এবং ব্যাবেজের পাশাপাশি, বোধহয় আরো জোরদার রকমে, আডা বায়রন লাভলেস, ক্রমে যুক্তি বা লজিকের স্তরে আবিষ্কার করলেন আজকের একটা ডিজিটাল কম্পিউটারের মূল অংশ এবং কাজগুলোকে। ডিফারেন্স ইঞ্জিনের ঢাক ব্যাবেজ আজীবন পিটিয়েই গেছেন, কিন্তু অ্যানালিটিকালের ব্যাপারে তিনি প্রথম থেকেই মনসা চিন্তিতং কর্মং বচসা ন প্রকাশয়েত। হয়তো এর মধ্যে লোককে বলা এবং না-বুঝিয়ে উঠতে পারার তিক্ত হতাশাও কিছুটা থেকে থাকবে। তখন তার কাছে উদ্দেশ্য একটাই, চিন্তাকে যন্ত্রের জগতে অনুবাদ করা, গোটা চিন্তা না হোক, চিন্তন প্রক্রিয়ার এক একটা খণ্ডকে। গাণিতিক চিন্তাকে। ঠিক আজকের একটা প্রোগ্রাম যা করে। খণ্ডটার জটিলতার মাত্রা যাই হোক, কম বা বেশি।

অ্যানালিটিকালকে ব্যাবেজ কতকগুলো অংশের সমাহারে ভেবেছিলেন। একটা অংশের নাম 'মিল' বা কল, সেটা হল হিশেব করার কলকজা। একটা অংশ 'স্টোর', বা ভাঁড়ার। সংখ্যাখচিত চাকাগুলোকে বারবার অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে। প্রতিবার তাদের অ্যাডজাস্ট করা মানে একটা সংখ্যা সমাহার ভরে দেওয়া — ওই সংখ্যাগুলো আপাতত রয়ে যাচ্ছে ওই ভাঁড়ারে, যতক্ষণ-না নতুন করে অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে। একটা অংশ 'ইনপুট', পাঞ্চড কার্ড পড়ার, সেখান থেকে

আদেশ এবং সংখ্যা নেওয়ার। আর একটা অংশ 'আউটপুট' — সে প্রিন্টারেই হোক বা কার্ডে। গঠনটাকে এবার চেনা লাগতে শুরু করছে?

একটা এইটি কলাম বা আশি স্তম্ভের কার্ড — তিন ইঞ্চি বাই সাত ইঞ্চি , এতে আশি সারি তথ্য ঢোকানো যায়, ফুটো করে

পাঞ্চড কার্ড
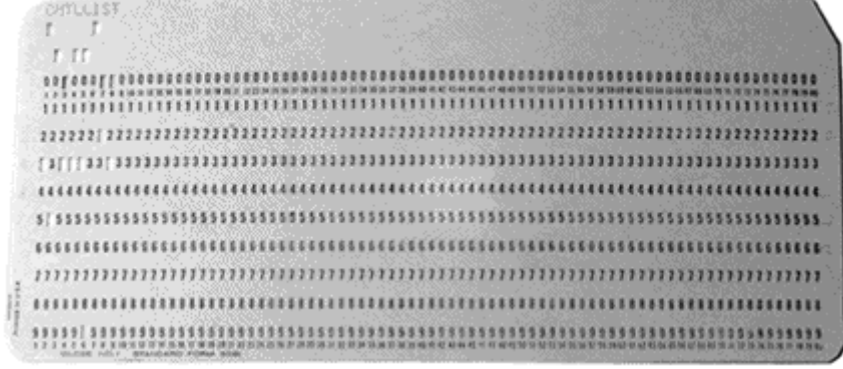
করে। আমরা জানি কী করে ফুটো দিয়েই সংখ্যা, অক্ষর, চিহ্ন পাঠানো যায়। সেগুলো জুড়ে জুড়ে তথ্য — বিট থেকে বাইট থেকে নানা মাপের ওয়ার্ড। শুধু কম্পিউটারে কার্ডের ফুটো থেকে তথ্য পড়ার একটা কল থাকতে হবে।

অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের এই পাঞ্চড কার্ড ব্যবহারের তরকিবটা এসেছিল জ্যাকার্ড লুম থেকে। জ্যাকার্ড লুম বা জ্যাকার্ডের তাঁত হল সেই প্রথম মেশিন যা পাঞ্চড কার্ড ব্যবহার করেছিল। ১৮০১ সালে ফরাসী উদ্ভাবক জোসেফ-মারি জ্যাকার্ডের তৈরি এই তাঁতে ২৪০০০ অব্দি শক্ত কার্ড লাগানো হত একটা ঘুরতে থাকা ড্রামে। যেখানেই কার্ডের গায়ে ফুটো আছে, সেখানেই একটা ছুঁচ ঢুকে গিয়ে পছন্দমত সুতো টেনে আনবে, আর ফুটো না-থাকলে ছুঁচটা নড়বে না। এভাবেই বোনা হবে কাপড়ের গায়ে নানা রঙের সুতোর আলপনা। সম্রাট নেপোলিয়ন এই মেশিনের জন্যে জ্যাকার্ডকে মেডেল দিয়েছিলেন। পরে এই পাঞ্চড কার্ডের আইডিয়া যায় ব্যাবেজের কাছে, এবং আরো পরে হেরমান হোলেরিথ-এর মেশিনে, যাতে স্ট্যাটিস্টিক্স-এর তথ্য নাড়াচাড়া করা হত। হেরমান হোলেরিথ-এর সেই

জ্যাকার্ড তাঁত

ব্যবসার কাজের মেশিন বানানোর ছোট্ট কোম্পানি, যার কাজ প্রথম জনমনযোগের পাদপ্রদীপে আসে মার্কিন সেন্সাসের প্রচুর তথ্য নাড়াচাড়ার কাজ দ্রুতবেগে করে দিয়ে, এই পাঞ্চড কার্ড ব্যবহার করে। ক্রমে বড় হতে থাকা এই কোম্পানির নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস। জানেন নাকি এই কোম্পানিটার কথা? শুধু নামের তিনটে শব্দের প্রথম বর্ণ দিয়ে পড়ে দেখুন তো একবার?

ব্যাবেজের অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন নিয়ে একটা লেখায় আডা লাভলেস লেখেন, জ্যাকার্ড লুম যেমন ফুটো করা কার্ড দিয়ে ফুল লতা পাতা ফোটায় কাপড়ের গায়ে, ঠিক তেমনি পাঞ্চড কার্ড দিয়ে অ্যালজেব্রার আল্পনা আঁকতে পারে ব্যাবেজের মেশিন। জ্যাকার্ড তাঁতের মত পাঞ্চড কার্ড আজো ব্যবহার হয় দেখবেন, সোয়েটার বোনার মেশিনে। এই পাঞ্চড কার্ডের কথা পরেও আসবে — এতে করেই কম্পিউটারে তথ্য ঢোকানো বার-করার কাজ চলেছে আধুনিক কম্পিউটারের গোড়ার দিকের প্রায় পুরো সময়টা জুড়েই। এতে বিটগুলো লেখা হয় সারিবদ্ধ ফুটো দিয়ে। এই ফুটো করার পদ্ধতির নাম হোলেরিথ কোডিং, হেরম্যান হোলেরিথ ১৮০০ সালে ফুটো কাজে লাগিয়ে এই তথ্য পাঠানোর পদ্ধতি তৈরি করেন। কার্ডটার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায়না, অপরিবাহী। যেখানে ফুটো সেখানে দুটো ধাতব অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটছে, মানে বিদ্যুৎ যাচ্ছে, মানে তথ্য। হোলেরিথ এই ধরনের মেশিন বানানোর ব্যবসা খোলেন, যা, অনেক অনেক পরে, আজকের দুনিয়ার কম্পিউটার দৈত্য আইবিএম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকগে, আমরা বেজায় রকমের কুপথে চলে যাচ্ছি, মানে ডাইগ্রেস করছি।

ব্যাবেজ এই জ্যাকার্ড লুমের ফুটো-করা কার্ডকে ব্যবহার করতে চাইলেন আরো অনেক সূক্ষ রকমে। তিনরকম ভাবে কার্ডের ব্যবহারের প্রস্তাব করলেন ব্যাবেজ।

'কার্ডস-অফ-দি-অপারেশনস', মানে কী করিতে হইবে তা যে কার্ডে লেখা থাকবে, যোগ না বিয়োগ না গুণ না ভাগ।

'কার্ডস-অফ-দি-ভ্যারিয়েবলস', মানে যাতে সেই স্তম্ভ বা কলামকে দেখানো হবে, যাদের শরীরের সংখ্যাগুলোকে করিতে হইবে, আর সেই চাকাগুলোকেও চিহ্নিত করা হবে, যেখানে গিয়ে এই করার ফলাফলটা পৌঁছবে।

'কার্ডস-অফ-দি-নাম্বারস', মানে, যাতে নির্দিষ্ট সব আঙ্কিক মান ভরা থাকবে, হিশেব করতে গিয়ে যাদের প্রয়োজন পড়ে। যেমন — পাই (π: ৩.১৪১৫৯২৬ . . .), ই (e: ২.৭১৮২৮১৮ . . .) ইত্যাদি।

আর, প্রত্যেকবারের প্রত্যেকটা কার্ডই কেবল তার নিজের জায়গায় ব্যবহার হবে তা নয়, কিছু নির্দিষ্ট কার্ডের এক একটা সমাহারকে বারবার করে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেরকম আধুনিক প্রোগ্রামিং ভাষায় লুপ ব্যবহার হয়। এবং কার্ডের গায়ে খচিত সংখ্যার মাধ্যমে দেওয়া কোনো শর্তের সাপেক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো কার্ডেও চলে যাওয়া যেতে পারে, মানে জাম্প। এই আলোচনায় বিশদ ভাবে আসছি আমরা, পরের সেকশনে, কম্পিউটার চিন্তনের ইতিহাসে।

ব্যাবেল বুঝেছিলেন যে শুধু হার্ডওয়ার নয়, তার ইঞ্জিন ঠিক ভাবে চালাতে গেলে একটা সফটওয়ারেরও প্রয়োজন পড়বে। এবং এই কাজে নিয়োগ করেছিলেন আডা লাভলেস নামে এক তরুণ কবিকে। আডা ছিলেন কবি বায়রনের একমাত্র বৈধ মেয়ে। পরে এই প্রথম সফটওয়ার অভিলাষিণীকে স্মরণ করে একটা কম্পিউটার ভাষার নাম রাখা হয়েছে আডা। আডা বলে এই কম্পিউটার ভাষাটা তৈরি করেছিল আমেরিকা সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স, সত্তরের দশকের শেষ দিকে, নতুনতর সফটওয়ার বানানোর উদ্দেশ্যে। এই জায়গাটায় ফের আমরা ফেরত আসব, আমাদের এই পাঠমালার শেষ মানে দশ নম্বর দিনে, ব্যাশ শেল প্রোগ্রামিং-এর প্রসঙ্গে কম্পিউটার ভাষার আলোচনায়।

১৮৩৩-এ ব্যাবেজ এই অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের কাজ শুরু করার পর থেকে ১৮৪২ অব্দি ব্রিটিশ সরকার ব্যাবেজের জন্যে বরাদ্দ করেন তখনকার দিনের সতেরো হাজার পাউন্ড, আর ব্যাবেজ তার নিজের টাকা থেকে খরচ করেছিলেন বিশ হাজার পাউন্ড। তিতিবিরক্ত হয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পিল জিগেশ করেছিলেন, মেশিনটা বানাতে আর কত সময় লাগবে হিশেব করার জন্যে ওই মেশিনটাকেই কাজে লাগালে হয়না?

আধুনিক কম্পিউটার প্রথম যারা বানান তাদের একজন হাওয়ার্ড আইকেন, চার নম্বর দিনে ভন নয়মান, আইকেন, জুসে, এবং এর পরবর্তী কম্পিউটার জেনারেশনের ইতিহাস — এইসব আসবে। এই আইকেনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, কম্পিউটার উদ্ভাবনের তার এই কাজের প্রেরণা তিনি পেলেন কোথা থেকে? ব্যাবেজের বইটা দেখিয়ে আইকেন বলেন, 'এই আমার কম্পিউটার শিক্ষা, ঠিক এইটুকু — এটাই সব, আমি যা করেছি সব এই বই থেকে

নেওয়া।' চার্লস ব্যাবেজের ১৮৩২-এ লেখা বই, 'ইকনমি অফ মেশিন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার্স' থেকেই জন্ম নিয়েছিল আজকের দুনিয়ার খুব জরুরি একটা বিদ্যা — অপারেশনাল রিসার্চ।

চার্লস ব্যাবেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার হল সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বা প্রেসিশন মেশিনিং এর এলাকাটায় — কী হবে এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মান, গঠন, ইত্যাদি। গণিতের ইঞ্জিন বানাতে ব্যাবেজের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ, সেই মুহূর্তের পৃথিবীর কোথাও যা সম্ভব ছিলনা। ব্যাবেজের অবদানটার গোটা নাটকীয়তাটা বোঝা যায়না ঠিক তার আগের শেষ অঙ্ক মেশিন কোলমারের অ্যারিথমোমিটারের সঙ্গে না মেলালে। ব্যাবেজ প্রথম চিন্তাপ্রক্রিয়াকে যন্ত্রে ধরার স্বপ্ন দেখালেন মানুষকে। ব্যাবেজের করা অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের ডিজাইনগুলোর ভিত্তিতে ১৯৯১-এ, তার সময়ে যেসব জিনিষপত্তর পাওয়া যেত, তাই দিয়েই, নতুন করে বানানো হয়েছিল অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন, এবং তারা নিখুঁত ভাবে কাজ করেছিল — ঠিক ব্যাবেজ যেরকম বলেছিলেন। ২০০১-এ বানানো হয় এমনকি এর প্রিন্টিং ইউনিটটাও।

২।। কম্পিউটার চিন্তনের বদলের ইতিহাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আগে আগে হাওয়ার্ড আইকেন, কনরাড জিউসে, ভন নয়ম্যান, উইলিয়ম মশলেদের ডিজিটাল কম্পিউটার থেকে পরবর্তী বদলগুলোয় আসব আমরা চার নম্বর দিনে। সেখানে মেশিনের ইতিহাস আর সেই মেশিনকে কাজ করানোর অপারেটিং সিস্টেমের ইতিহাস এক সঙ্গে জড়িয়ে, তাদের আলাদা করা যায় না। কিন্তু আজ যে হার্ডওয়ারগুলোকে চিনতে চিনতে আমরা এলাম সেগুলোয় কিন্তু সেই অর্থে কোনো সফটওয়ার নেই, মেশিনের সঙ্গে সফটওয়ারের জায়গাটা তৈরিই হয়নি তখনো। সেই তৈরি হওয়াটা একটা খুব বড় বদল, যুক্তির স্তরে, যুক্তিবোধের স্তরে, সেই যুক্তিবোধ দিয়ে বাস্তবতাকে চিন্তা করার স্তরে। তার পূর্বশর্তগুলো তৈরি হচ্ছিল ব্যাবেজের কাজ থেকে, বা আরো ভালো করে বললে, লাভলেস-ব্যাবেজের কাজ থেকে, বোধহয় সেখানে আগে লাভলেস, পরে ব্যাবেজ।

এবং, যা আমরা একাধিকবার আগেও বলেছি, একা কিছু হয়না, অনেক মানুষ নানা ভাবে চেষ্টা করতে থাকে, ইতিহাসের নানা পর্যায়ে, সেগুলোর মধ্যে আপাতগোপন কিছু সময়ের ছক রয়ে যায়, হঠাৎ একজনের চোখে পড়ে সেটা, সে তখন সেই লাইনে এগোয়, তার এগোনোটা তার সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার কাজের মধ্যে রয়ে যায় আবার নতুনতর কিছু ছকে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা। অনেক মানুষ এবং অনেক সময় মিলে কাজগুলো করে। এই অনেক মানুষের মধ্যে মধ্যে থেকে আরো দুজনকে আমরা বেছে নেব, জর্জ বুলি আর অ্যালান টুরিং, আমাদের এই কম্পিউটার চিন্তনের ইতিহাসের আলোচনায়। বাদ পড়বেন আরো বহু মানুষ, বাদ পড়বে আরো বহু সময়, যার পুরোটার এমনকি ইতিহাসও নেই। বাদ পড়বেন ভন নয়ম্যান, নরবার্ট ওয়েইনার যারা প্রথম যুগের কম্পিউটার চিন্তাকে গজিয়ে তুলেছিলেন, বাদ পড়বেন কম্পিউটার জগত থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত বার্নারস লি, আজকের আমাদের কম্পিউটারময় জীবনের পিছনে রয়েছে যাদের শ্রম ও স্বপ্ন, যে স্বপ্নের অনেকটাই ধর্ষিত হয়েছে মাইক্রোসফট ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক পুঁজির হাতে। যাই হোক, আসা যাক লাভলেস ও ব্যাবেজের কথায়।

২.১।। প্রথম প্রোগ্রামার আডা লাভলেস এবং রগচটা প্রতিভা চার্লস ব্যাবেজ

চার্লস ব্যাবেজকে এই রগচটা প্রতিভার অভিধা, 'ইর‍্যাসকিবল জিনিয়াস', দিয়েছিলেন ব্যাবেজের এক জীবনীকার। ব্যাবেজের রগচটা ক্রোধ ছিল প্রবাদপ্রতিম। ব্যাবেজ ছিলেন অভিজাত উচ্চবিত্ত ঘরের থরোব্রেড ইংরেজ। তার এই বিত্ত গোটাটাই গেছিল ওই অসমাপ্ত উদ্ভাবনে। ব্যাবেজের উদ্ভাবন কিন্তু ওটাই প্রথম নয়। এর আগে কাউক্যাচার বানিয়েছিলেন ব্যাবেজ। স্টিম-ইঞ্জিনের ট্রেনের সামনে যা লাগানো হত, পথভোলা দিওয়ানা গরুরা যাতে কোনো দুর্ঘটনায় না-পড়ে, তখনকার ইংলন্ডে ওদের তো কোনো জীবনবীমা থাকত না।

গোটা একটা শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রিকে, তার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার উপায় উদ্ভাবন করেন ব্যাবেজ, আগেই বলেছি, অপারেশনাল রিসার্চ। তার এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া তিনি কাজে লাগান মুদ্রণ-শিল্পের উপরেই, তার ফলাফল এই হয় যে, ব্যাবেজের নিজেরই পাবলিশার চটে গিয়ে ব্যাবেজের বই ছাপা বন্ধ করে দেয়। ব্যাবেজই দেখান, পোস্টে কোনো চিঠি পাঠানোর সময়, কতটা দূরত্ব চিঠিটা যাবে সেই অনুযায়ী দাম ঠিক করার জন্যে যা খরচ হয় তা পাঠানোর

খরচের চেয়ে বেশি। ব্রিটিশ পোস্টব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে নিয়মটা বদলে সব দূরত্বের জন্যে একই দাম করে দেয়, গোটা পৃথিবী জুড়েই এখনো যা চালু।

রেলপথের প্রথম স্পিডোমিটার বানান ব্যাবেজ। ইনশিওরেন্স বা বীমার রিস্ক আর প্রিমিয়াম, ঝুঁকি আর দেয়, নিয়ে বই লেখেন, যা থেকে বীমা কোম্পানিগুলো প্রচুর লাভ করে। সাইফারিং ডিসাইফারিং করতে, সঙ্কেত বানাতে এবং পাঠোদ্ধার করতে জানতেন ব্যাবেজ। এবং পরবর্তীকালের কম্পিউটার এনক্রিপশন বা সঙ্কেতীকরণের ভাবনার কিছু জায়গা এসেছে তার কাজ থেকেই। গাছের গুঁড়ির মধ্যে পরপর রিং গুলোয় যে আবহাওয়া বদলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে এটাও তিনিই প্রথম বলেন। এগুলো গেল কেজো আইডিয়া, ব্যাবেজের প্রচুর আইডিয়া ছিল গুংগা মেশিনের মতই বিদঘুটে। তাদের বিদঘুটেপনা ইতিহাসের হাতে প্রমাণিততর হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক সম্পর্কে ব্যাবেজ ছিলেন ওইসব আইডিয়ার মতই বিদঘুটে এবং উৎকেন্দ্রিক। লন্ডনের রাস্তার ভ্রাম্যমান অর্গান বাজিয়েদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় চিঠি লিখতেন ব্যাবেজ, বিপরীতে তারাও এসে বাজনা ঘাড়ে সদলে জড় হত ব্যাবেজের জানলার নিচে।

১৮২২-এ ব্যাবেজ রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটির সভায় একটা ছোট মডেলের সক্রিয় ডিফারেন্স ইঞ্জিন দেখান ব্যাবেজ, সোসাইটি তাকে মেডেল দেয়। পরের বছর থেকে তার গ্রান্ট আসা শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার যে ডিফারেন্স ইঞ্জিনের অর্ডার দেয় সেটার আকার ছিল বড্ড বেশি বড়। মূলত টেকনোলজির প্রতিবন্ধকতায় ব্যাবেজের কাজ শেষ হয়না। নানা লোকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা শুরু করে দেয়, পাগলা বুড়ো চার্লি ব্যাবেজ, ইত্যাদি। এইসবের বিরুদ্ধে, সরকারের গ্রান্ট বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইটা চলছে, এই অবস্থায় এই সময়ে তার মাথায় আসে পরবর্তী আইডিয়া — অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন, তার কাছে মহত্তর, অন্যের কাছে উন্মাদতর। ব্যাবেজের যুক্তিটা ছিল এই যে, এক ধরনের একটা হিশেব যদি মেশিনে করা যায় তাহলে যে কোনো জটিলতার যে কোনো হিশেব কেন মেশিন দিয়ে করা যাবেনা? বিরাট বিরাট জাম্বো হিশেব? অনেক রকমের অনেক হিশেব করার জন্যে আলাদা আলাদা মেশিন বানাব কেন? একটা বড় মেশিন বানাব, তার নানা অংশগুলো নানা সমাহারে এসে নানা ধরনের হিশেব করবে। ব্যাবেজের এই সর্বব্যাপী হিশেবকল — ইউনিভার্সাল ক্যালকুলেটিং মেশিনের ধারণাটা এসে বিস্ফোরিত হয়েছিল অনেক পরে অ্যালান টুরিং-এর চিন্তাকাঠামোয়।

'মিল', 'স্টোর' এবং 'কার্ড' দিয়ে তৈরি ব্যাবেজের এই অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের ছকটা তো আমরা আগেই বলেছি। মিল বা হিশেবক দশমিকের পর মাত্র পঞ্চাশ ঘর পর্যন্ত হিশেব করবে, দুর্ধর্ষ গতিতে এবং একটাও ভুল ছাড়া — গ্যারান্টি। আর স্টোর বা ভাঁড়ার এক হাজার খানা পঞ্চাশ অঙ্কের সংখ্যা ধরে রাখতে পারবে তার ডান্ডা এবং গিয়ার লাগানো উদরে। ফুটোসজ্জিত কার্ডমালা সংখ্যা জুগিয়ে যাবে ক্ষুধার্ত ভাঁড়ারকে। ফলাফল বেরিয়ে আসবে স্বয়ংক্রিয় ছাপার যন্ত্রে।

শুধু তাই নয়, দরকার পড়লে কার্ড দিয়ে এই আদেশও দেওয়া যাবে মিলকে যে তুমি আপাতত কিছু সংখ্যা তুলে রাখো ভাঁড়ারের তাকে, পরে হিশেবের কাজে প্রয়োজনমত ফেরত এনো। অর্থাৎ কার্ড পড়ার যন্ত্র বা কার্ড-রিডিং-ডিভাইসটাই এখানে নিয়ন্ত্রক এবং সিদ্ধান্তকারী সংস্থা, কনট্রোল এবং ডিসিশন-মেকিং ইউনিট হয়ে কাজ করবে। আমাদের শূন্য নম্বর দিনের কাজের ভিত্তিতে একটা কম্পিউটারের ছকের সঙ্গে তুলনা করুন — আমরা একে খাপে খাপে মিলিয়ে ফেলতে পারছি আজকের আধুনিক একটা পিসির কাজের ছকের সঙ্গে। মিল এখানে সিপিইউ। স্টোর হল বিভিন্ন রকমের মেমরি উপাদান। কার্ড হল ইনপুট ডিভাইস আর কন্ট্রোল ইউনিট। আর প্রিন্টার হল আউটপুট ডিভাইস। এই কার্ড নামক ইনপুট এবং কন্ট্রোল ডিভাইসের কারণেই এই অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন কম্পিউটারের প্রাগইতিহাস থেকে বেরিয়ে এল আধুনিক কম্পিউটারের সঙ্গে আত্মীয়তার গৌরবে।

ব্যাবেজের মেশিনের এই ইনপুট সংস্থা কম্পিউটার তথা প্রোগ্রামিং-এর ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল মাইলস্টোন। পাঞ্চড কার্ডের আইডিয়া এসেছিল জ্যাকার্ড লুম থেকে, আমরা আগেই বলেছি। জ্যাকার্ড তাঁতে সুতো টানার জন্যে ব্যবহার হত ধাতুর তৈরি শক্ত ছুঁচ, আর অলঙ্করণ বানানোর ছকটা দেওয়া হত শক্ত কার্ড দিয়ে, যে কার্ডে এমনিতে ছুঁচগুলো আটকে যাবে, ঢুকতে পারবে একমাত্র ফুটো থাকলেই। তাঁতের প্রত্যেকবার ঘোরায় ছুঁচাবলীর সামনে আসবে একটা নতুনতর কার্ড। স্বয়ংক্রিয় হিশেবের পরিকল্পনা ব্যাবেজের মাথায় এল এই ফুটো করা কার্ড থেকেই। গাণিতিক চিন্তন

প্রক্রিয়ার বিমূর্ত অবয়বকে মূর্ত বস্তুতে হাজির করার এই প্রথম কোনো উপায় পাওয়া গেল। একটা জটিল হিশেবের সম্পূর্ণ সম্ভাব্য আকারটাকে ভেঙে ফেলা হল ছোট ছোট পদক্ষেপে — একটা ফ্লো-চার্ট বা প্রবাহ তালিকায়।

ফ্লো-চার্ট হল সময়ানুক্রমিক ভাবে পরপর আসার ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে ফেলা একটা ক্রিয়াপদ্ধতি। প্রোগ্রাম করার আগে কী করতে চাইছি — গোটা কাজের প্রোজেক্টটাকে এরকম ফ্লো-চার্টে ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু ফ্লো-চার্ট করা যেতে পারে যে কোনো কাজেরই। একটা বড় কোনো কাজকে ছোট ছোট সহজবোধ্য সরলবোধ্য ছোট ছোট কাজলেট বা কুচো কাজে ভেঙে ফেলা, যা এমনকি বুদ্ধিকুলতিলক একটা রোবট বা কম্পিউটারও পরপর করে যেতে পারবে। প্রোগ্রামিং শেখার শুরুতে ছাত্রদের ফ্লো-চার্ট বানাতে হয় — ফ্লো-চার্ট ব্যাপারটা এই কাজের তালিকাটাকে একটা ছবি দিয়ে বোঝায়।

কার্ডের পর কার্ডে এবার দেগে দেওয়া হল ফ্লো-চার্টটাকে। এই কার্ডগুলো এবার পরপর অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের মিল মানে সিপিইউ-টাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, একদল বাধ্য সৈনিকের মত। কাজটা বদলানো দরকার, ঠিক আছে, আর এক সেট কার্ড আনো, বদলে ফেলো সৈনিকদের, যারা পাহারা দিয়ে চলেছে মিলকে, ঠিক ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক কাজ করাচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়াটাকে নিজের মনের আয়নায় খুব ভালো ভাবেই দেখতে পেয়েছিলেন ব্যাবেজ, কিন্তু সেটা কাঠ আর লোহা আর পিতলের কলকব্জায় সঠিক ভাবে অনুবাদ করতে পারেননি শত চেষ্টাতেও, আগেই তো বললাম, শতাব্দীটা ভুল ছিল তার জন্মানোর এবং কাজ করার পক্ষে।

আডা লাভলেস

কিন্তু অন্তত একজনকে পেয়েছিলেন ব্যাবেজ যে এই পুরো ব্যাপারটা তারই মত করে, বা হয়তো তার চেয়েও বেশি দার্শনিক গভীরতায় দেখতে পেয়েছিল। আডার সঙ্গে ব্যাবেজের এবং তার ইঞ্জিনের যখন প্রথম মোলাকাত হয় আডা লাভলেস তখনো কুমারী আডা বায়রন। আডার বাবা কবি বায়রন ছিলেন তার সময়ের ইংলন্ডের সবচেয়ে কেচ্ছাতাড়িত মানুষদের একজন। লেডি বায়রন অভিযোগ করেন বায়রনের নিজের এক বোনের সঙ্গে বায়রনের যৌনতার, পরবর্তী ঘটনাধারা যার সম্ভাব্য সত্যতার দিকেই ইঙ্গিত করে, সেই বোনের যে সন্তান হয় তার সঙ্গে আডার মিলের কথা উল্লেখ করে এই মন্তব্য করেছেন আডার এক জীবনীকার। আডার জন্মের একমাস পর থেকে বায়রন কখনো আর আডার মার কাছে আসেননি। কিন্তু তার একাধিক কবিতায় আডার উল্লেখ আছে। আডার মা, তার সময়কার অন্যান্য স্বাধিকারপ্রমত্তা ভিক্টোরিয়ানীদের মতই আর একজন। নিজের সুন্দরী কিন্তু ঠোঁটকাটা, প্রতিভাবান কিন্তু দলছুট কন্যা আডাকে সামলানোর মত ব্যক্তিত্বের অভাবেই হয়ত, লেডি বায়রন ছোটবেলা থেকেই আডাকে অভ্যস্ত করেন লডেনাম বা আফিমজাত ড্রাগ মেশানো টনিকে, যে নির্ভরতার থেকে আডা তার জীবনের ছত্রিশ বছরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আডার মা বেঁচে ছিলেন মেয়ের মৃত্যুর পরেও।

খুব ছোটবেলা থেকেই আডার গাণিতিক প্রতিভার কমতি ছিলনা। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধুদের একজন ছিলেন অগাস্টাস ডি মরগান, জর্জ বুলির পাশাপাশি আধুনিক সিম্বলিক লজিকের বা চিহ্ননির্ভর যুক্তিবিজ্ঞানের আর একজন

সহ-জন্মদাতা। আডার গণিতশিক্ষার কিছুটা এই ডি-মরগানের কাছে। তারপর যা স্ফূরণ পেতে শুরু করে ব্যাবেজের সান্নিধ্যে। তখনকার ইংলন্ডে চল ছিল নানা নতুন যন্ত্র এনে অভিজাতদের পার্টিতে একটা প্রদর্শনী দেওয়া। শিল্পবিপ্লবের ব্রিটেনে সবচেয়ে বড় প্রতিমা বা ফেটিশ তখন যন্ত্র। এই রকমই একটা পার্টিতে হাজির ছিলেন অগাস্টাস ডি মরগানের স্ত্রী শ্রীমতী ডি মরগান এবং আডা, যেখানে ব্যাবেজ তার ডিফারেন্স ইঞ্জিন নিয়ে আসেন। পরে তার স্মৃতিচারণে শ্রীমতী ডি মরগান লিখেছেন —

> একটা আয়না দেখে বা বন্দুকের আওয়াজ শুনে জংলিরা যেমন করে তাকায় বলে শুনেছি, অন্য সবাই যখন সেইরকম করে ওই চমৎকার উদ্ভাবনটা দেখছিল, আমাদের কুমারী বায়রন তখন, আরো ছোট তো, লেগে গেল বুঝতে — কেমন করে কাজ করছে, আর আবিষ্কারটার সত্যিকারের সৌন্দর্যটা দেখল (While the rest of the party gazed at this beautiful invention with the same sort of expression and feeling that some savages are said to have shown on first seeing a looking glass or hearing a gun, Miss Byron, young as she was, understood its working and saw the great beauty of this invention.)।

এই উদ্ধৃতিটা অবশ্যই প্রতিভাবান কিশোরী আডার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে চিহ্নিত করে। কিন্তু আমি অনুবাদ করলাম আরো একটা মজায়। আজ থেকে মোটামুটি ১৭৫ বছর আগে, তার মানে প্রচলিত পঁচিশ বছর হারে সাতটা জেনারেশন, অর্থাৎ, নিজের চারপাশে বলয়ে বলয়ে পরিবর্দ্ধমান ঔপনিবেশিক ইংলন্ডের ক্রমগজায়মান কলোনি নেটিভ ভারতে, ওই 'জংলি' বা 'স্যাভেজ' অভিধায় ধরা হচ্ছে আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার পনেরো বয়স্ক ঠাকুর্দাকে বা তার চল্লিশ বয়স্ক বাবাকেও। মালেরা কি হেভি চমকাত বন্দুকের শব্দে? আমি তো যদ্দূর জানি, আমার একটা সুস্পষ্ট লেঠেল পাইক খুনোখুনির জিনিলজি আছে, একটা বল্লমও দেখেছি আগে, ছোটবেলায়, আমার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, পুরো সালা-লুট-লিয়া বল্লম। সেই বল্লমের থেকে বন্দুকের জোরের এফিসিয়েন্সিতেই ইংরেজরা বোধহয় লেঠেলতর করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে গেল। অথচ দেখুন, অতীশ দীপঙ্কর চীন থেকে শুধু বৌদ্ধশাস্ত্ররাশিই আনেননি, এনেছিলেন বারুদ বানানোর টেকনোলজিও। যাকগে।

অন্যদের কাছে এই ক্যালকুলেটর আর একটা প্রদর্শনীর জলের পাম্পের থেকে আলাদা কিছু ছিলনা, কিন্তু আডাকে এটা চূড়ান্তভাবে উত্তেজিত করল। আডা বায়রন — পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার হুইজ কিড। আডা সেই হাতে গোনা কয়েকজনের একজন যারা ব্যাবেজের এই ইঞ্জিনকে এর আগের প্রজন্মের যান্ত্রিক ক্যালকুলেটরগুলোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বলে চিনতে পেরেছিল। আগের প্রত্যেকটা যান্ত্রিক ক্যালকুলেটরই ছিল অ্যানালগ, যারা পরিমাপ দিয়ে কাজ করে, কিন্তু ব্যাবেজের এই মেশিন হল ডিজিটাল, হিশেব করছে গুনে গুনে, এক দুই তিন করে। অন্য অ্যানালগদের কাছে যেখানে হয়ত ৩৬ ডিগ্রি বা এক ইঞ্চি মানে এক, ৭২ ডিগ্রি বা দুই ইঞ্চি মানে দুই, ইত্যাদি। সবসময়ই একটা ভৌত-মান আর তার সংখ্যা-মানের ভিতর অনুবাদ-প্রতিবাদ করে চলতে হয় অ্যানালগদের। তার চেয়েও বড় কথা ব্যাবেজের এই মেশিনই প্রথম যেখানে গণিতের আর যুক্তিবিজ্ঞানের, অ্যারিথমেটিক আর লজিক, দুই ধরনের কাজই এক সঙ্গে আনা হল। মিল করছে পাটীগণিত আর কার্ড করছে যুক্তিবিজ্ঞান।

ব্যাবেজ তার জীবনের শেষ দিকে সদ্য জন্মানো বুলি আর ডি মরগানের লজিক হাতে পেয়েছিলেন, কিন্তু আডা তখন আর বেঁচে নেই। লেডি অগাস্টা আডা বায়রন কাউন্টেস অভ লাভলেসের জীবনটা ছিল সংক্ষিপ্ত, ছত্রিশ বছরের, ১৮১৫-র দশই ডিসেম্বর থেকে ১৮৫২-র সাতাশে নভেম্বর। ঠিক যে বয়সে তার বাবা বায়রনও মারা গেছিলেন, দূরে পরবাসে, গ্রীসে। প্রফেসর মরিয়ার্টির কথা বলতে গিয়ে শার্লক বলেছিল, রক্তে রয়ে যাওয়া শিল্প কখন কী আকার নেবে বলা যায়না, আর্ট ইন ব্লাড টেকস কিউরিয়াস টার্নস, বাবা বায়রনের উত্তরাধিকার তেমনি আডাকে কখনো শান্ত থাকতে দেয়নি। বাজনা বা ক্যালকুলাস, কখনো তীব্র সক্রিয়তা, কখনো চূড়ান্ত ডিপ্রেশন। এই নিরবচ্ছিন্নভাবে অসুস্থতাক্রান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল জীবনে আডাকে কিছুটা সময় শিলন-এর সুইস জেলেও কাটাতে হয়েছে।

অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন বা এই ধরনের লজিক ডিভাইস নিয়ে ঠিক কী কী করা যেতে পারে তাই নিয়ে আডার চিন্তা ছিল ব্যাবেজের থেকেও স্বতন্ত্র। আডার লজিক শিক্ষার হাতেখড়ি ডি মরগানের কাছে। এবং এই ধরণের আধা গাণিতিক আধা যুক্তিবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপে আডার ওস্তাদি এতটাই ছিল যে ব্যাবেজ লিখেছিলেন, "এটা ও আমার চেয়েও ভালো বোঝে, এবং আমার চেয়ে বহু বহু গুণ ভালো বোঝাতে পারে"।

উনিশ বছর বয়সে আডা বিয়ে করেন ব্যারন অফ লাভলেসকে, তিনিও গণিতজ্ঞ, তবে আডার দরের নন। গাণিতিক ইঞ্জিন নিয়ে ব্যাবেজ আর আডার যৌথ প্রকল্প চলতেই থাকে। ব্রিটিশ ক্ষমতার অপছন্দের সামনে দাঁড়িয়েও ব্যাবেজের কাজে আডা তার শর্তহীন সমর্থন জানাতে কখনো কসুর করেননি। মূলত ব্যাবেজের উৎসাহেই অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন সংক্রান্ত নিজের গোটা নোটসটা আডা প্রকাশ করেন। এবং সেই নোটস পুরোটাই, এতদিন পরেও, যৌক্তিক ভাবে সম্পূর্ণ বোধ্য। এবং প্রোগ্রামারদের কাছে অবশ্যই মূল্যবান।

পরিষ্কার বোঝা যায়, অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের এই তাত্ত্বিক তার নিজের সময়ের থেকে কতটা এগিয়ে ছিলেন। ম্যাথামেটিকাল গেজেটে আডার নোটস নিয়ে নিউম্যান মন্তব্য করেন যে এই নোটসগুলোই প্রমাণ, আডা লাভলেস একটা প্রোগ্রামড কম্পিউটারের প্রতিটি নীতিই বুঝতে পেরেছিলেন, কম্পিউটারটা ঘটে ওঠার প্রায় একশো বছর আগে। ব্যাবেজের মেশিনে তথ্য আর সমীকরণ ঢোকানোর ওই পাঞ্চড কার্ডের কাজ নিয়ে বিশেষ ভাবে মনোযোগী ছিলেন আডা। তার 'অবজার্ভেশন অন মিস্টার ব্যাবেজস অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন' নামে একটা লেখা থেকে একটা প্যারা অনুবাদ করা যাক।

> কার্ড লাগানোর কথা মাথায় আসা মাত্র, পাটীগণিতের সীমানাগুলো ভেঙে বেরিয়ে গেল, অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন আর নিছক 'ক্যালকুলেটিং মেশিন'-গুলোর সঙ্গে একই জমিতে দাঁড়িয়ে রইল না। এর নিজেরই একটা অবস্থান হল, এবং এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে যে যে ধারণাকে জাগিয়ে তুলল সেগুলো চূড়ান্তভাবে চিত্তাকর্ষক। *সাধারণ* চিহ্নগুলোকে (*জেনেরাল* সিম্বল) একত্রে নিয়ে আসার কৌশলটা, তার অন্তহীন বৈচিত্র এবং প্রসার নিয়ে, একটা ঐক্যের বন্ধন তৈরি করল পদার্থের ক্রিয়া আর বিমূর্ততম গাণিতিক বিজ্ঞানের বিমূর্ত মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। গাণিতিক বিশ্লেষণের (*অ্যানালিসিস*) ভবিষ্যত ব্যবহারের একটা নতুন, প্রসারিত এবং শক্তিশালী ভাষা জন্ম নিল, যা দিয়ে সত্যের চর্চা করা যাবে, যাতে সেটা এতটাই দ্রুত এবং ত্রুটিহীন রকমে মানবজাতির বাস্তব প্রয়োগে আসতে পারবে যা এর আগে কখনো ভাবা যায়নি। তাই শুধু মানসিক এবং প্রাকৃতিক নয়, গণিত জগতে যা তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক তারা এবার এ অন্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এল। অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনকে যা স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করছে তার তুল্যমূল্য কোনো ভূমিকা অন্য কোনো কিছুর বেলায় প্রস্তাবিত হয়েছে, বা এমনকি কোনো বাস্তবিক সম্ভাবনা হিশেবে একটা চিন্তা-করা যুক্তি-বদ্ধ কোনো কিছুকে ভাবাও হয়েছে — এরকম কোনো তথ্য আমাদের গোচরে নেই।

> The bounds of *arithmetic* were, however, outstepped the moment the idea of applying cards had occurred; and the Analytical Engine does not occupy common ground with mere "calculating machines." It holds a position wholly its own; and the considerations it suggests are most interesting in their nature. In enabling mechanism to combine together *general* symbols, in successions of unlimited variety and extent, a uniting link is established between the operations of matter and the abstract mental processes of the *most abstract* branch of mathematical science. A new, a vast and a powerful language is developed for the future use of analysis, in which to wield its truths so that these may become of more speedy and accurate practical application for the purposes of mankind than the means hitherto in our possession have rendered possible. Thus not only the mental and the material, but the theoretical and the practical in the mathematical world, are brought into intimate connexion with each other. We are not aware of its being on record that anything partaking of the nature of what is so well designated the *Analytical* Engine has been hitherto proposed, or even thought of, as a practical possibility, any more than the idea of a thinking or a reasoning machine.

আমি জানিনা, আপনারা উত্তেজিত হচ্ছেন কিনা, আমি হয়েছিলাম, এই প্যারাটা পড়ে। প্যারাটা দেখুন, শুধু নামটা বদলে দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যেত ডিজিটাল কম্পিউটারের কোনো প্রারম্ভিক বর্ণনা বলে। এবং, পড়ামাত্রই আমার মাথায় এলো, একশো বছরেরও বেশি আগে লেখা এই প্যারাটার চেয়ে বড় সায়েন্স ফিকশন আর কী হতে পারে। ভাবুন, কম্পিউটারের গোটা ধারণাটা, মানবজীবনের উপরে তার প্রভাবিত বদলের নাটকীয়তাটা এতটাই বিচিত্র এবং আগের অভিজ্ঞতার থেকে ভিন্ন যে কোনো একটা সায়েন্স ফিকশনেও তো আমি কখনো কোনো ভবিষ্যদ্বানী পাইনি কম্পিউটারের। থমাস মোরের ইউটোপিয়া বাদ দিন, ওটা সাহিত্যের চেয়ে দর্শন বলা ভালো। গোড়ার দিকের এডগার অ্যালান পো বা মার্ক টোয়েন বা রুডিয়ার্ড কিপলিং থেকে শুরু করে জুল ভের্ন, এইচ জি ওয়েলস, এডগার রাইস বারোজ, আর্থার কোনান ডয়েল, আলডুস হাক্সলে অব্দি আমি একটা লেখাও মাথায় আনতে পারছিনা, বা

আরো পরের ব্রিলিয়ান্ট রুশ লেখক ভ্যালেন্টিলা ঝুরাভলিওভা অব্দিও, কেউ কম্পিউটার আসার আগে কম্পিউটারকে লিখেছেন। রে ব্রাডবেরির পুরোনোতম লেখা আমি যা পেয়েছি, ফারেনহেইট, ১৯৫৩-র লেখা, তখন কম্পিউটার এসে গেছে, গৌরবের দিকে এগোচ্ছে। রে ব্রাডবেরির মত যাদুকরের আস্তিনে আরো কিছু থাকতে পারে — আমি জানিনা। আপনাদের যদি এইরকম কোনো সায়েন্স ফিকশন মাথায় আসে একটু জানাবেন।

গণিতজ্ঞ আডার এতে উৎফুল্ল হওয়ারই কথা যে বড় বড় পরিশ্রমসাধ্য কষে যাওয়ার কাজগুলো এবার মেশিনই করতে পারবে। কিন্তু, আডার বেলায়, তার চেয়েও বড় গতিটা তৈরি হল এই ইঞ্জিনের প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত নীতিগুলোকে তাদের চূড়ান্ত জায়গা অব্দি বোঝার চেষ্টা করা। যদি ওই বয়সেই মারা না যেতেন, আডা বোধহয়, সেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দাঁড়িয়েই সত্যিকারের প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ-এ পৌঁছে যেতে পারতেন। ইঞ্জিনটা তখনো তৈরিই হয়নি, আডা ওই কার্ডে প্রদেয় আদেশ-তালিকা বা ইন্সট্রাকশন সিকোয়েন্সগুলো ঠিক কী রকম হতে পারে তাই নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন এমন কিছু কায়দা যা আজকের কম্পিউটার ভাষাগুলোতেও অত্যন্ত প্রাথমিক এবং জরুরি জায়গা। সাবরুটিন, লুপ, জাম্প। এই প্রসঙ্গটা একটু মাথায় রাখবেন, এখানটায় বেশ বড় করে আমরা ফেরত আসব আমাদের পাঠমালার শেষ মানে দশ নম্বর দিনে।

ধরুন অনেক ছোট ছোট সরলতর হিশেবকে একত্রে সমাহৃত করে, বুনে বুনে, গড়ে তোলা হচ্ছে একটা জটিল এবং বড় হিশেব। এবার এই ছোট অংশগুলোর অনেকগুলোই বারবার আসবে, একই ধরনের হিশেব, একই রকম কিছু পদক্ষেপ, এক একটা গুচ্ছে, বারবার আসতে থাকবে। বারবার প্রত্যেকবার আপনাকে মোট বড় হিশেবটার মধ্যে লিখে যেতে হবে সেগুলো, ছোট ছোট স্টেপগুলোর সেই সমাহারটা, স্টেপগুলোর সংখ্যা বারোটাও হতে পারে আবার একশো চুয়াল্লিশটাও হতে পারে। তার চেয়ে এই বারবার একই আকারে ব্যবহৃত স্টেপগুচ্ছকে কেন বাপু একবার একটা জায়গায় লিখে ফেলো না? — একটা সাবরুটিনে? এইরকম সব সাবরুটিনরা সব এক সঙ্গে থাকবে একটা লাইব্রেরিতে, প্রয়োজন পড়লেই আমাদের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যে লাইব্রেরি থেকে যে কোনো সাবরুটিনকে ডেকে নিতে পারবে, যতবার খুশি, যেখানে খুশি। এক নম্বর দিনে আমরা যে সি প্রোগ্রামটা লিখেছিলাম, তার স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার ‘stdio.h’ ফাইলটা এইরকম একটা লাইব্রেরি ফাংশন, তবে নিছক সাবরুটিনের অর্থে নয়, ওখানে হার্ডওয়ার কী ভাবে ব্যবহার করবে সেই সিস্টেম-কলের ব্যাপারটাও ছিল। আজকের আমাদের ব্যবহারের প্রতিটি কম্পিউটার ল্যাংগুয়েজেই এই রকম এক একটা লাইব্রেরি থাকে।

অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন খুব দ্রুত প্রচুর প্রচুর হিশেব বারবার করেই যেতে, করেই যেতে, পারত। সেই করেই চলার আদেশগুলো অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনে দেওয়া শুরু হল কার্ড দিয়ে। যেই কার্ড দিয়ে আদেশ দেওয়া শুরু হল, তখনই, খেয়াল করুন, একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যাচ্ছে কোনো একটা বিশেষ আদেশের কার্ডে ফেরত যাওয়ার। কারণ সেই আদেশের কার্ডটা তো মেশিনে ভরাই আছে। এবার, এটা চিন্তার মাত্র আর একটা মোচড় যে, আর একটা কার্ড দিয়ে আদেশ দেওয়া যায় যে তুমি ওই বিশেষ কার্ডটায় ফেরত যাও। যেই এই ব্যবস্থাটা উদ্ভাবিত হল যাতে একটা কার্ড মেশিনকে আদেশ দিতে পারবে আগের কোনো একটা কার্ডে ফেরত যেতে, তারপর ফের পরপর কার্ড অনুযায়ী কাজ করে যাবে মেশিন — তৈরি হল লুপ। আবার চলতে চলতে ফের আসবে সেই কার্ডে যা তাকে ফেরত পাঠিয়েছিল, আবার ফেরত যাবে পুরোনো কার্ডে। এই ভাবে চলতেই থাকবে যতক্ষণ অব্দি এই ফেরত যাওয়ার সার্কিট চালু থাকবে। যতক্ষণ না আর একটা কার্ড দিয়ে আমরা এই লুপের বাইরে বেরিয়ে আসতে বলছি ইঞ্জিনকে। ধরুন মিলে হিশেব চলছে একটা সিরিজের। পরপর সমস্ত ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বর্গের যোগফলের একটা সিরিজ। আমরা একটা মান ক পেতে চাইছি, যখন

$$ক = ১^{২} + ২^{২} + ৩^{২} + \ldots$$

এবার ওই ফেরত পাঠানোটা ততক্ষণ অব্দিই চলবে যতদূর অব্দি পূর্ণসংখ্যা আমরা চাইব।

ধরুন আমরা এই সিরিজটাকে হিশেব করতে চাইলাম ১০০ অব্দি, ঠিক করলাম যে, ১০০-ই হবে এই সিরিজের সবচেয়ে বড় পূর্ণসংখ্যা। তার মানে ফেরত পাঠানোটা চলতে থাকবে যতক্ষণ-না বর্গ করছি যে পূর্ণসংখ্যাটার তার মান ১০০ হয়। এই খেয়ালটা রাখছে ওই ফেরত পাঠানোর কার্ডটাই, ১০০ নামক সংখ্যাটাকে সে রেখে দিয়েছে স্টোর-এ। যেই বর্গ করার সংখ্যাটা এই রেখে দেওয়া সংখ্যাটার সমান হচ্ছে অমনি সে লুপটাকে বন্ধ করে দিল। আর

ফেরত যেতে হবেনা, এবার মিল আবার এর পরের কার্ড অনুযায়ী পরপর হিশেব করে যেতে পারবে। এরপরেই যদি থাকে যোগফলটা ফুটিয়ে তোলার আদেশ লেখা কার্ড তাহলে সে যোগফলটাকে পাঠিয়ে দেবে প্রিন্টারে। আজকের প্রতিটি কম্পিউটার ভাষার একদম প্রাথমিকতম একটা অস্ত্র এই লুপ আদতে আডার আবিষ্কার।

এখানে তো আর রাখতে পারছি না, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চস্তরের ডকুমেন্টেশন আছে, একদম আডার লেখা মূল আদেশগুলো তুলে দিয়ে দিয়ে, জন ওয়াকারের সাইটে, অটোক্যাড যাদের তৈরি তার একজন (http://www.fourmilab.to/babbage/cards.html)। আডা লাভলেস দিয়ে সার্চ মারলে আরো বহু কিছু পেয়ে যাবেন, লেসটা কিন্তু এল এ সি ই (Lovelace), যদিও, আডার জীবনটা যা, এল ই এস এস (Loveless) হলে বোধহয় বেশি মানাত। আডার জীবনী লিখেছেন ক্যাথরিন এলিয়ট, তার সাইটেও আডা সম্পর্কে বহু কিছু আছে, বিশেষত আডার আবেগজগতের তথ্য (http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~elliotk/Ada/Bio.html)।

আডা ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, তার কবরটা যেন হয় তার বাবার কবরের ঠিক পাশেই, হয়ত মার প্রতি বিতৃষ্ণাতেই আরো। ১৮১৬-য় বায়রন ইংলন্ড থেকেই চলে যান, তখন আডার বয়েস এক বছর। আডার আট বছর বয়েসে বায়রন মারা যান, গ্রীসে। যদিও তখনো সমাপ্ত হয়নি তার স্ত্রীর সঙ্গে তার আদালতের লড়াই। ... the child of love, though born in bitterness/ And nurtured in convulsion — প্রেমের সন্তান, তবু জন্মেছিল ক্লেদে, আশ্রিত আক্ষেপের ক্রোড়ে — এটা বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ডস পিলগ্রিমেজ (Childe Harold's Pilgrimage) থেকে, যেখানে আডাকে নিয়ে, আডার নাম করে ছড়ানো আছে অজস্র লাইন।

বায়রন খুব কষ্ট পেয়েছেন আডার সঙ্গে দেখা না-করতে পেরে, কিন্তু লেডি বায়রনের ক্রোধ আর তিক্ততা আডা আর বায়রনের মধ্যে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আডার মৃত্যু অব্দি। মৃত্যুশায়ীন আডার একটা ছবি এঁকেছিলেন লেডি বায়রন, সেটা ক্যাথরিন এলিয়টের সাইটে আছে, এলিয়ট আমার ইমেলের উত্তর না-দেওয়ায় ছবিটা এখানে দিতে পারলাম না। ছবিটার নিচে ডানদিকের কোণে সবচেয়ে মনোযোগের বিন্দুতে লেডি বায়রনের সই, আডার চোখ বন্ধ, রুগ্ন আঙুলে বালিশের কিনারটা আঁকড়ানো, যে আঁকছে সে তার মা, গোটা ব্যাপারটাই অনেকটা স্ট্যানলে কুব্রিকের ফুল মেটাল জ্যাকেট বা বার্গম্যানের সেভেন্থ সিলের মত, কাফকার কাসলের মত — বাংলায় কোনো শব্দ নেই, বাঙালির ইতিহাসে কোনো বিশ্বযুদ্ধ নেই বলেই হয়ত, একটাই শব্দ আসতে পারে — গ্রোটেস্ক।

তখন সদ্যআবিষ্কৃত বিদ্যা সিম্বলিক লজিক বা সাঙ্কেতিক যুক্তিবিজ্ঞানের জমিতে আডার চাষবাসের সবচেয়ে বড় প্রমাণ শর্তাধীন লাফ বা কন্ডিশনাল জাম্প। কার্ড-পাঠের যন্ত্রটাকে দিয়ে আর একটা কায়দা আবিষ্কার করলেন আডা। এখানে আর নির্দিষ্ট কিছু পুনরাবৃত্ত কার্ডের সমাহারকে তুলে রাখা এবং পরে যখন যখন তাদের প্রয়োজন তখন নামিয়ে ব্যবহার করা নয়, এবার আদেশ দেওয়া হবে কার্ড রিডার যাতে লাফ দিয়ে চলে যায় যে কোনো কার্ড সমাহারের যে কোনো জায়গায়, যদি — খেয়াল করুন — শব্দটা স্ক্রিনে আঙুল রেখে পড়ুন — যদি — একটা নির্দিষ্ট শর্ত বা কন্ডিশন পালিত হয়। এই একটা 'যদি' প্রোগ্রামিং চিন্তনের মানে কম্পিউটার চিন্তনের জগতে সবচেয়ে বড় ভাঙচুরগুলোর একটা। কন্ডিশনাল জাম্প।

নিন্দুকেরা বলে, কম্পিউটার জগতে তার অবদান অনেকটা রান্নাবান্নার জগতে রাঁধার পরে খাবার তুলে রাখবার বাটির মত, মানবসভ্যতার ইতিহাসে উর্বরতম বেনেদের একজন, বিল গেটস, সেই তিনিও একবার, এমনকি, একটা হাই লেভেল কম্পিউটার ভাষা বানানোর চেষ্টা করেছিলেন, কম্পিউটারের ইতিহাসে খাজাতম ভাষার একটা, সেই বেসিকে একটা ৬৪ এমবি জেনিথে নিউমেরিকাল অ্যানালিসিসের নিউটন-র‍্যাফসন মেথডের প্রোগ্রাম লেখার চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি, বারবার ইনফিনিট লুপে পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক জীবনের অবশিষ্ট জায়গায় আমার অভিজ্ঞতার মতই, তাতে আমরা এই লাফটা দিতাম 'গো-টু' (goto) বলে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে। ধরুন এইরকম — ইফ বোর হচ্ছেন গোটু পরের দিন। এই যাঃ, এটা আমি সত্যি সত্যি বলেছি নাকি।

এই ছোট্টটা 'যদি'-টা যোগ হওয়া মাত্র ইঞ্জিনের কাজের এলাকা বিশুদ্ধ পাটীগণিত ছেড়ে বেরিয়ে এল, শুধু ওই রাশি রাশি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ গুষ্টির পিণ্ডিই করে যাওয়া নয়, এখন সে সিদ্ধান্ত নেয়, যত কুটীরশিল্প আকারেই হোক, তৃতীয় বিশ্ব রকমেই হোক, ইঞ্জিনটা এখন, অর্থপূর্ণ সম্ভাব্যতা নিয়েই, ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী।

আডা কিন্তু লিখেছিলেন, কোনো একদিন হয়ত ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রকৌশলের থেকে অনেক অনেক বেশি মাত্রার সামর্থ নিয়ে মেশিন তৈরি হবে, এবং সেদিন এই অর্থপূর্ণ সম্ভাবনাগুলো কী চূড়ান্ত আকার নেবে তা নিয়ে জল্পনাও করেছেন আডা — কোনোদিন কি সত্যিকারের বুদ্ধিমান মেশিনও বানানো যাবে? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা যন্ত্র-মনন নিয়ে তার মন্তব্যকে প্রায় একশো বছর বাদে তুলে এনেছিলেন অ্যালান টুরিং, আর একটা উন্মাদ প্রতিভা, আডার বক্তব্যকে টুরিং ডেকেছেন লেডি লাভলেসের আপত্তি বলে। আডার যুক্তি ছিল এই যে, "অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন এই ভান করেনা যে সে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। সে শুধু তাই-ই করতে পারে যা আমরা জানি কী ভাবে তাকে করতে বলতে হবে।"

হয়তো অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের অসমাপ্তির হতাশা এখানে একটা ইন্ধন আকারে কাজ করে থাকতে পারে, আডা ক্রমে চূড়ান্ত ভাবে জুয়ার নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। গোটা জীবনে একমাত্র যার কাছ থেকে কিছুটা যত্ন পেয়েছেন সেই লর্ড লাভলেসের প্রত্যক্ষেই প্রথম দিকে, পরে ক্রমে তাকে গোপন করে। ব্যাবেজও ক্রমে জড়িয়ে পড়েন আডার এই জুয়ার চক্করে। আডার এই অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনে উৎসাহের একটা জায়গা ছিল এই দিয়ে ঘোড়দৌড়ের নম্বর হিশেব করতে পারা। দু-দুবার লর্ড লাভলেসের পারিবারিক গয়না গোপনে বন্ধক দেন আডা, ধার জমে যাওয়া বুকিদের ব্লাকমেল বন্ধ করার চেষ্টায়। আডার জীবনের চূড়ান্ততম হেরে যাওয়ার মুহূর্তও আসে এই সময়েই — বন্ধক দেওয়া গয়না ফেরত পাওয়ার জন্যে যখন তাকে নিজের মা লেডি বায়রনের কাছে হাত পাততে হল, লর্ড লাভলেসকে গোপন করে।

এই জুয়ার কাজে ডিফারেন্স ইঞ্জিনকে ব্যবহারও করেছেন ব্যাবেজ আর আডা। এই করতে করতে একদিন, মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো, আডা ক্যান্সারে পড়লেন। ব্যাবেজ তার পরেও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন আর তিনিও শেষ করতে পারলেন না, হয়তো আডার অনুপস্থিতিও একটা প্রাণশক্তি নিয়ে নিয়েছিল তার। অসুস্থতায় আর মৃত্যুতে উজ্জীবিত আডার এই জীবনের সঠিক কাহিনী লিখতে গেলে আডা-ব্যাবেজের বন্ধু, মানুষের এবং ঈশ্বরের আভ্যন্তরীন শুভতায় বিশ্বাসী, চার্লস ডিকেন্সকে দিয়ে চলত না, লাগত এডগার অ্যালেন পোর মত কোনো তান্ত্রিক কাপালিক। আডা মৃত্যুর আগে ব্যাবেজকে লিখেছিলেন, অ্যান্ড প্রে ডু নট কোয়াইট ফরগেট মি, ফর আই থিংক দেয়ার সিমস সাম ডেঞ্জার অফ ইট। রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি — তবুও তো প্যাঁচা জাগে

২.২।। জর্জ বুলি — চিন্তার ব্যাকরণ

কমলা জিগেশ করেছিল হেরমান হেসের সিদ্ধার্থকে, যুবক, কী পারো তুমি? কী-টাকে এখানে নাগরী লীলাসুন্দরী লাস্যময়ীর ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়া কৌতূহলের ঔদ্ধত্যের অ্যাকসেন্ট সহ পড়তে হবে। সিদ্ধার্থ বলেছিল, আই ক্যান থিংক, আই ক্যান ওয়েট, আই ক্যান ফাস্ট। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনের কলোনিয়াল অ্যাকাডেমিয়া ঠিক এই প্রশ্ন করেছিল জর্জ বুলিকে। বুলি কোনো উত্তর দিতে পারেননি, গরিব ঘরের ছেলে, অত সাহিত্য পড়বেন কখন? আর আনফরচুনেটলি, উপন্যাসটা তখনো লেখা বা লেখার পর জর্মন থেকে অনুবাদ হয়নি, হেরমানের তখনো জন্মই হয়নি।

বুলি বা বুলির লজিক সাইবার ইতিহাসের সিনে ল্যান্ড করেছিল বড্ড দেরিতে, অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের ডিজাইনের পিছনে সমাসীন কম্পিউটার ভাবনাটাকে বদলানো আর তখন সম্ভব না। কিন্তু পরের যুগের পরের শতাব্দীর সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা কম্পিউটারের ঘটে ওঠার পিছনে আডা-ব্যাবেজের ঠিক পরেই যার নাম আসে তিনি জর্জ বুলি (১৮১৬-১৮৬৪)। বুলি ছিলেন আডা-ব্যাবেজের সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যের জগত থেকে অনেকটা দূরে।

১৮৩২-এর এক বিকেলে ঘাসজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নড়তে নড়তে, আকস্মিক, কেকুলে যেমন হঠাৎ একটা স্বপ্নে, একটা সাপের নিজের লেজ গেলার চেষ্টা দেখে, খুঁজে পেয়েছিলেন জৈবযৌগের কার্বন বন্ডের রহস্য, সতেরোর সদ্যযুবক জর্জ বুলির মাথায় গজিয়ে উঠেছিল সেই তত্ত্ব যার গোটাটা নিজেই বুঝে বুঝিয়ে এবং লিখে উঠতে তাকে সময় নিতে হবে আরো বাইশ বছর — 'অ্যান ইনভেস্টিগেশন অফ দি ল-জ অফ থট' বেরোবে ১৮৫৪-য়। এই গজিয়ে ওঠাটা বুলির নিজের কাছেও এতটা অব্যাখ্যনীয় যে এর কথা বলতে গিয়ে তিনি 'আনকনশাস' শব্দটা ব্যবহার করেন। বুলির এই গজিয়ে ওঠা আইডিয়াকে ক্রমে একটা পূর্ণাঙ্গ বিদ্যার রূপ দেন বুলি নিজেই। বুলির লজিকের

আলোচনা করতে গিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছিলেন, বিশুদ্ধগণিত মানে পিওর ম্যাথামেটিক্স আসলে উদ্ভাবন-ই করেছেন বুলি।
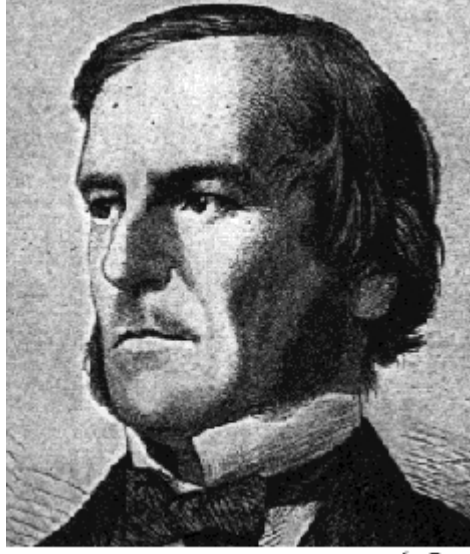
জর্জ বুলি

ওই প্রথম যৌবনেই বুলি লক্ষ করেন, মানুষের যুক্তিনির্মাণ বা রিজনিং বা লজিক-কে অনেকটাই ধরা যায় বীজগণিত বা অ্যালজেব্রা দিয়ে। এবং তার এই বীজগাণিতিক সমীকরণ দিয়ে চমৎকার সমাধান করা যায় লজিকের যে কোনো সমস্যা। কিন্তু অন্য একটা সমস্যা সমাধানের চাবি বুলির হাতে একটুও ছিলনা। তোমার পিতৃপরিচয় না থাকলে তুমি যাই বলো তোমার কথা কেউ শুনবে না। পিতৃপরিচয় মানে পরিচয় দেওয়ার মত একটা পিতৃকুল। তোমার বাপ গরিব মুদি — এটা স্ট্যান্ডার্ড একটা পরিচয় হল? বুলি যাই বলুন, যতই বিধবংসী এবং বিপ্লবী, তাকে পাত্তা দেওয়ার মত কাউকে পাওয়া গেলনা ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিতে। আর একটা সমস্যা ছিল এই যে লজিককে তখনো একটা গাণিতিক এলাকা বলে চিনতেই শেখেনি গণিতজ্ঞরা। সেটাই তারা শিখল, বুলির কাছে, গত দেড়শো বছর ধরে। এমনকি বুলি যখন ছাপালেন তার প্রথম লেখা সেটাও কেউ পড়ল না, তার মৃত্যুর অনেক পর অব্দিও বুলিকে পড়তে শেখেনি পৃথিবী। ১৮৪৮-এ 'কেমব্রিজ অ্যান্ড ডাবলিন ম্যাথামেটিকাল জার্নাল'-এ বেরোনো 'দি ক্যালকুলাস অফ লজিক' অন্তত গোটা পঁচিশেক ওয়েব সাইটে এখন সগর্বে প্রদত্ত, এর একটা, এইচটিএমএল পিডিফ লাটেক ডিভিআই সব ফর্মাটেই দেওয়া আছে — http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/ — গিয়ে দেখুন, আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসের একটা জ্যান্ত খণ্ড, কত গল্প রয়ে গেছে লেখাটার সঙ্গে। যদি না-ও পড়েন লেখাটা, ব্রাউজারে খুলে স্ক্রিনে একটু আঙুল বোলাবেন। দেলুজ আর গুয়াতারি লিখেছিল না, সভ্যতা এগিয়েছে বেদনা থেকে বেদনাতরতায়, সঙ্কট থেকে সঙ্কটতরতায়?

পৃথিবী বুলিপাঠ শিখল অনেক পরে, যখন কম্পিউটার ক্রমশ জন্মে উঠছে, সময়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা সমস্ত টুকরো টুকরো উপাদানগুলো একত্রে মিলে যাচ্ছে, একটা তখনো-অদৃশ্য ছকে, কদিন বাদেই দৃশ্য হয়ে উঠবে, কম্পিউটারের কর্মমান জীবন্ত শরীরে। ছকের অনুপস্থিত জায়গাগুলো মেলাতে গিয়ে পাগলের মত অনুসন্ধান করে চলেছেন সব, চার নম্বর দিনে যে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব, ভন নয়মান, আইকেন, জুসে, মশলে — এরা সব, এবং এদেরও আগে, অ্যালান টুরিং। কম্পিউটার বানানোর একদম কাঁচা বাস্তবিক কাজটা করতে গিয়ে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়াররা দেখলেন, তাদের এমন এক ধরনের গাণিতিক যন্ত্রপাতি দরকার যা আপাতত নেই।

পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের মধ্যে এই ধরনের পারস্পরিকতা বারংবার ঘটেছে। একদম সেই ওয়েভ পার্টিকল ডুয়ালিটির সময় থেকে। এর সবচেয়ে নাটকীয় উদাহরণ নন-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি। কোথায় কোন পাগলের মত সব স্বতঃসিদ্ধের বিদঘুটে এক জ্যামিতি খাড়া করলেন, করেই রাখলেন, নিকোলাই ইভানোভিচ লোবাচেভস্কি (১৭৯২-১৮৫৬), গেয়র্গ ফ্রিডরিখ বার্নহার্ড রিমান (১৮২৬-১৮৬৬) — এরা সব। আনতাবড়ি সব পাগলামি — কারোর কোনো কাজে লাগেনা। আর একজন, ছোটবেলা থেকেই যার মাস্টারমশাইরা বলে আসছেন, ছেলেটার বুদ্ধিটা তেমন

কিছু ইয়ে নয়, পৃথিবীকে চিন্তাকে দর্শনকে একমুহূর্তে বদলে দেওয়ার মত একটা তত্ত্ব বানালেন, গত শতাব্দীর শুরুতে, জিটিআর। জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটিটা থিওরি আকারে ঘটেই উঠতে পারত না ওই নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিগুলো না থাকলে। কারণ, দেখা গেল, আইনস্টাইনের তত্ত্ব মোতাবেক ব্রহ্মাণ্ডের মডেলটা দাঁড় করানো যায় একমাত্তর ওই জ্যামিতি দিয়েই।

বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রয়োজনীয় গণিতটা এবার দিল বুলির বীজগণিত, তার সময় তার পৃথিবী যাতে কান দেয়নি। নতুন ধরনের এই কম্পিউটার তৈরি করতে গিয়ে, ১৯৩০-এর দশকে, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি করতে হচ্ছিল সার্কিটের একটা জটিল জাল, যার প্রত্যেকটা সার্কিট-খণ্ড এক একটা সুইচ এই অর্থে যে, কোনো না কোনো একটা বিদ্যুৎ প্রবাহকে কোনো না কোনো ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ওই খণ্ডটা, প্রত্যেকটা খণ্ডই। মোট সার্কিটের এই সবগুলো খণ্ডকে, সুইচকে, মিলিয়ে তৈরি হয় কম্পিউটারের বৈদ্যুতিক স্নায়ুতন্ত্র, যা দিয়ে বিদ্যুৎ-প্যাকেট যায় কম্পিউটারের মধ্যেই এক ঠাঁই থেকে আর এক ঠাঁই — বিদ্যুৎ সিগনাল দিয়ে তথ্য। এবার ওই বিদ্যুৎ মানে তথ্যকে যদি ওই সুইচদের দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করাতে হয় তাহলে দ্বিধাহীন রকমের নিখুঁত ভাবে ওই সার্কিটাংশগুলোর ব্যবহারকে হাজির করতে হবে বীজগাণিতিক সমীকরণ দিয়ে। ব্যবহার বলতে — কী নেয় আর কী দেয় এক একটা সুইচ — কতটা বিদ্যুৎ কী ভাবে ঠিক কোথা দিয়ে ঢোকে তাদের ভিতর, এবং কতটা কোথায় কী ভাবে বেরিয়ে আসে। কারণ ওই বিদ্যুৎপ্যাকেটগুলোই তথ্য। তথ্য মানে তথ্য এবং আদেশ। বিদ্যুৎ স্পন্দন দিয়ে এখন থেকে বিধৃত এবং বিবৃত হবে 'এবং' (AND), 'অথবা' (OR), এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওই 'যদি' (if)। এর সঙ্গে ক্যালকুলেটরসই 'যোগ' 'বিয়োগ' 'গুণ' 'ভাগ' তো আছেই। এবার তাহলে এমন একটা নতুন ধরনের বীজগাণিতিক সমীকরণ লাগবে যাদের দিয়ে কম্পিউটার সার্কিটের এই যাবতীয় ব্যবহার এবং ধর্মকে হাজির করা যায়।

এখানে বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলো একদম যুক্তিবিদ্যা বা লজিকের প্রক্রিয়াতেই কাজ করছে, তাই লজিকের সমস্যা মেটানো যায় এমন কোনো যন্ত্রপাতি যদি পাওয়া যায় — তাদের দিয়েই এই বৈদ্যুতিক সার্কিটের কাজও করা যাবে, সার্কিট এবং লজিক এই দুইয়েরই অপারেটরগুলো যখন কাজ করছে একই নিয়মে। ১৯৩০-এর দশকের সেই শেষের দিকে, তখন কেউই জানেনা এমন কোনো গণিতের কথা যা দিয়ে লজিকের এইসব কাজকর্ম করা যায়। সময়ের ভাঁজে গোপন রয়ে যাওয়া ছকগুলো খুঁজে পেতে একটা সঠিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সঠিক মন লাগে। তখন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ওস্তাদ ছাত্র, পরবর্তীকালে ইনফরমেশন থিওরির পথিকৃৎ, ক্লদ শ্যানন, খুঁজে পেলেন বুলির বীজগণিত — বৈদ্যুতিক সার্কিটের কাজকর্মের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যাওয়া একটা আস্ত গাণিতিক তত্ত্ব। তৈরি হল ডিজিটাল কম্পিউটারের বিসমিল্লা।

আজীবন দারিদ্রতাড়িত, নিজে নিজে শিক্ষিত হয়ে ওঠা একটা মাস্টারের, আডার সঙ্গে একই বছরে জন্ম, অথচ যার জুয়া তো দূরের কথা, বইপত্র কেনার পয়সাও থাকত না সবসময়, জনবিস্মৃত কালবিস্মৃত ওই একপিস তত্ত্ব যদি না-থাকত, লজিক আর গণিত আর সার্কিটের ভিতর ওই যোগটা তৈরি হতে পারতনা। প্রায়-গজিয়ে-ওঠা কম্পিউটার পেটে নিয়ে প্রতীক্ষা করতে হত পোয়াতি ধরিত্রীকে, যদ্দিন না কোনো বুলি আসে, মানে বুলির কাজটা করে দেয় আর কোনো বুলি। বুলির অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যেরকম স্টেরয়েডী দৌড় শুরু করল সেটা তখন সম্ভবই হতনা। অথচ সেই বেচারা মাস্টার কিন্তু কোনোদিন একটা ভ্যাকুয়াম টিউব বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট চোখেও দেখেনি — দেখতে গেলে তাকে একটু বড্ড বেশি দীর্ঘজীবি হতে হত।

ডিরাক তার ম্যাগনেটিক মনোপোল বা চৌম্বক একমেরুর জন্যে যতটা জনচিত্তে সেনসেশনাল, তার চেয়েও বেশি বোধহয় এই গল্পে যে, ল্যাবরেটরিতে ডিরাক ঢুকলেই, তত্ত্বের তাত্ত্বিকতার তাপ ডিরাকের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ত এতটাই, ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সব ভুলভাল রিডিং দিতে শুরু করত। ডিরাক মানেই — এনিথিং থিওরেটিকাল চলছে, এনিথিং প্রাক্টিকাল চলবেনা। মেশিনের সঙ্গে ডিরাকের এতটাই আশনাই ছিল বলে শোনা যায়। বুলির বেলায় এরকমটা যদি নাও ঘটে, অন্তত ব্যাবেজ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, আর বুলি ছিলেন গণিতজ্ঞ। উঁচুনিচু ঘাসজমিতে হাঁটতে হাঁটতে নৃমুণ্ডের আবছায়ায় ওইসব গজিয়ে ওঠা, আর তারপর সেগুলোকে তত্ত্বে নামিয়ে আনার জন্যে নিজেকে দুই দশক ধরে প্রয়োজনীয় গণিতটা শিখিয়ে তোলা, এরপর যে অ্যাকাডেমিয়াবিস্মৃত তত্ত্বটা তৈরি হয়েছিল, আজ সেটাই হয়ে দাঁড়াল সফটওয়ারের অভ্যন্তরে চিন্তাপ্রক্রিয়ার বিমূর্ত যৌক্তিক গঠন আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মূর্ত ভৌত বাস্তবতা — এইদুটোর ভিতর একমাত্র সংযোগ।

ব্যাবেজ আর বুলি এই দুজন কাজে এসেছেন দুটো আলাদা স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু সেই দুটো স্বপ্নেরই একত্র মিলিত আকার আপনার টেবিলের এই পিসিটা যার স্ক্রিনে এটা আপনি পড়ছেন। তার নিজের সামাজিক জাগতিক অবস্থান, বা অবস্থানের অভাব, যাই হোক, বুলির স্বপ্নের অভাব ছিলনা। বুলির এক ছাত্র অনেক পরে তার স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন, উনি পড়াতেন যখন, মনে হতনা একজন শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষাচ্ছে, মনে হত একজন শিল্পী ক্যানভাসে ছবি আঁকছে তুলি দিয়ে। এখানে বুলির যে ছবিটা আমরা দিলাম সেটাই সর্বত্র পাওয়া যায়, অনেকটা সেই হাতিবাগানে জুতো কেনা শ্যামবাজারের শ-সম্পন্ন ভূপর্যটক মন্দার বোসের রোলে কামু মুখার্জির মত দেখতে লাগছে, কিন্তু তাও, হয়তো ভাবতে চাইছি বলেই ভেবে নিচ্ছি, চোখদুটো আলাদা।

মাত্র ষোল বছর বয়েসে পরিবারের অর্থনৈতিক অনটন বুলিকে বাধ্য করেছিল ইশকুলের চাকরি নিতে, ছেলেদের অঙ্ক শেখাতে শেখাতেই নিজেরও শেখার শুরু। আরও অঙ্ক তো তাই যা শেখার জন্যে পয়সা লাগেনা, ল্যাবরেটরি নেই, অল্প দু-একটা বই হলেই হয়। সতেরোয় বুলির কাছে উদ্ভাসিত হয় গণিত ও বিমূর্ত চিন্তার সেই নতুনতর তত্ত্ব। বুলি তার কুড়ি বছর বয়েসে এসে খুঁজে পান সেই জায়গাটা যা তার সময়ের সবচেয়ে বড় গণিতজ্ঞরাও ধরতে পারেননি — অপরিবর্তনীয়তা বা ইনভ্যারিয়েন্সের একটা বীজগাণিতিক তত্ত্ব, যা, পরে, অনেক পরে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্বের একটা স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৪৯ অব্দি বুলি পড়িয়েছেন ওই এলিমেন্টারি স্কুলেই, তারপর তার ছাপা হওয়া লেখাগুলোর ভিত্তিতে কাজ পান আয়ারল্যান্ডের কর্কে, কুইনস কলেজে। তারও পাঁচ বছর পরে বেরোয় 'অ্যান ইনভেস্টিগেশন অফ দি ল-জ অফ থট', যার ভিত্তিতে লেখা 'ম্যাথামেটিকাল থিওরিজ অফ লজিক অ্যান্ড প্রোবাবিলিটি'। ইউক্লিড যেমন জ্যামিতির একদম গোড়ার বক্তব্য এবং নিয়মগুলোকে তৈরি করে দিয়েছিলেন তার স্বতঃসিদ্ধ আর উপপাদ্য, অ্যাক্সিওম আর থিওরেম দিয়ে, ঠিক তেমনি জর্জ বুলি বীজগাণিতিক চিহ্ন দিয়ে যুক্তিবিজ্ঞানকে বোঝার একদম গোড়ার জায়গাটাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। বুলি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের যৌক্তিকতার ভিত্তিটাই হল লজিক।

গণিত আর বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই দু দুটো বিষয়কে আমূল বদলে দেওয়ার পরেও, বুলির এই তত্ত্বের সবচেয়ে জরুরি জায়গাটা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বেশ সহজ কিছু নীতির উপর। ঠিক যে অ্যালজেব্রা আমরা ইশকুলে শিখি সেটা থেকেই শুরু করেছেন বুলি, তারপর অ্যালজেব্রার সাধারন নীতিগুলোয় সামান্য কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বদল — এই দিয়েই তিনি লজিকের কলকব্জাগুলোকে এনে ফেলেছেন বীজগণিতে।

যুক্তিবিজ্ঞান বা লজিক, আর হিশেব বা ক্যালকুলেশন, এই দুটো আপাত অনন্বিত জগতকে একত্রে এইরকম ঘেঁটে দেওয়ার জন্যে যে গাণিতিক তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন বুলি সেই জগতে রাশি মাত্র দুটো — ব্রহ্মাণ্ড বা ইউনিভার্স, আর শূন্যতা বা নাথিং। তাদের জন্যে চিহ্ন দুটো হল ১ আর ০। বুলি তখনো জানতেন না, আপনি জানেন এখন, বারবার ইতিমধ্যেই আমাদের কথা হয়েছে, এই তত্ত্বটাই তৈরি করে দিল একটা দ্বিরবস্থা-কাঠামো, টু-স্টেট-সিস্টেম, যা দিয়ে একদিকে যেমন লজিককে নিয়ে আসা যায় পরিমাপযোগ্য সংখ্যার জগতে, তেমনি ভ্যাকুয়াম টিউব বা রিলে-সিস্টেম ইত্যাদি ভৌত উপাদানের ক্রিয়াকেও চমৎকার চিত্রন করা যায়, যাদের কাজটা সবসময়েই ঘটে এইরকম দ্বিরস্থায়, একটা অবস্থা যখন বিদ্যুৎ আছে মানে হ্যাঁ মানে ১, অন্য অবস্থাটা হল যখন বিদ্যুৎ নেই মানে না মানে ০।

বুলির বীজগণিতের এই চিহ্ন আর ক্রিয়া, সিম্বল আর অপারেশন দিয়ে লজিকের সমস্যাকে অনাবিল এনে ফেলা যায় বীজগণিতের সমীকরণে, এবং তারপর তাদের সমাধান করে দেওয়া যায় ধ্যাড়াধ্যাড় করে, জাস্ট কিছু সিম্পল অ্যালজেব্রা দিয়েই। সেই অপারেশন বা ক্রিয়াগুলো একেবারেই গণিতের, কিন্তু তা দিয়েই তখন সমাধান করা যায় লজিকের সেই সমস্যাগুলোকে যা আসলে চিন্তন প্রক্রিয়া সঞ্জাত।

মানুষের যুক্তিবোধ চিন্তা আর লজিক এতটাই সম্পৃক্ত বলে, বুলি তার এই তত্ত্বকে ডেকেছিলেন যুক্তিবোধের গণিত বা 'ক্যালকুলাস অফ রিজনিং' বলে। মানুষের যুক্তিবোধকেই যেন তিনি ধরে ফেলছেন তার গণিত দিয়ে। বুলির ধাত্রীবিদ্যায় যে ছানা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আজ সে রীতিমত সোমথ, আজ আমরা জানি, মানুষের যুক্তি বা রিজন নামক যন্ত্রটা এই বীজগণিতের কাঠামোয় কষে ফেলার তুলনায় অনেক বেশি ক্যাঁচালপ্রবণ, জটিল, দ্বর্থশীল, নিয়মভাঙা, এবং শক্তিশালী — কনফ্লিকচুয়াল, কমপ্লিকেটেড, অ্যামবিগুয়াস, আনপ্রেডিক্টেবল, এবং পাওয়ারফুল। আর আরো একটা জটিল খেলা চলে যুক্তি শব্দার্থ ছবি এবং ধারণাকে মিলিয়ে — শব্দের অর্থ বা ধারণা যেখানে তার প্রদত্ত অর্থের

অন্টলজিকাল খাঁচা থেকে মানে শব্দ থেকে নিরন্তরই খসে যাচ্ছে, ধারণা যেখানে তার আধার মানে শব্দ থেকে শুধুই সরে যাচ্ছে, স্থগিত থাকছে, ডেফার ও ডিফার করছে, জাক দেরিদা যাকে ডেকেছেন দিফেরঁস বলে। সেই জটিল খেলাটা এবার এই যুক্তিবোধের আত্মসচেতনতার প্রশ্ন নিয়ে আসছে, যুক্তিবোধ দিয়ে যুক্তিবোধকে বোঝার প্রাথমিক প্যারাডক্সে ঠেলে দিচ্ছে গোটাটাকে। যাই হোক, সেইসব ক্যাঁচালপ্রবণ জায়গা নিয়ে কথা বলা জন্যের এই জিএলটি ইশকুল পাঠমালা নয়, আমরা ফেরত আসি বুলির গণিত এবং কম্পিউটারের কথায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৌশলের জগতের পক্ষে আডা-ব্যাবেজ বা বুলি কাউকেই মননগত আশ্রয় দেওয়া সম্ভব ছিলনা। তাদের কাজের উপ্ত সম্ভাব্যতাকে তার ঘটমানতায় ফুটিয়ে তোলার পক্ষে টেকনোলজিটা ছিল বড্ড বেশি দুধেভাতে। আজকের ইলেকট্রনিক ভাবে নির্মিত ডিজিটাল কম্পিউটারে যেটা সম্ভব হয়েছে। আডা-ব্যাবেজ এবং বুলি সময়ের ভাঁজে তাদের অসমাপ্ত এবং আপাত অসফল কাজগুলোকে রেখে যাচ্ছিলেন — পরবর্তী সময়ের যোগ্য পাঠকের জন্যে — ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান। স্পিলবার্গের ক্যাচ-মি-ইফ-ইউ-ক্যানের ফ্র্যাংক যেমন, বুক ভেঙে যাওয়া বেদনা ও প্রতিভার সমাহার নিয়ে এক সতেরোর কিশোর, আডা-ব্যাবেজ আর বুলিও তাই। হয়ত তাই, জিএলটির পাঠমালার জন্যে ততটা প্রয়োজনীয় না-হওয়া সত্ত্বেও আমি না-লিখে পারলাম না। আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থট। এই দিনের আলোচনার একটা বড় অংশই আমি আপনাদের জন্যে লিখছিলাম না, লিখছিলাম নিজেরি জন্যে, না-লিখে পারছিলাম না, সত্যিই।

২.৩।। বুলির লজিক আর শ্যাননের সার্কিট

একটা জিনিষ বাকি আছে এখনো — পরের যুগের ইনফরমেশন থিওরির প্রবক্তা ক্লদ শ্যানন (১৯১৬-২০০১) যেভাবে বুলিকে আনলেন, কম্পিউটারের সার্কিটের প্রয়োজনীয় গণিতের আকারে সেটা নিয়ে দু-একটা কথা বলার আছে। এখানে না বললেও চলত, কারন নেটে প্রচুর পাওয়া যায় এই বিষয়ে। কিন্তু আমাদের মধ্যমগ্রাম জিএলটির, গ্নু-লিনাক্স ঠেকের প্রথম মিটিং-এ গৃহীত প্রস্তাবে যেমন আমরা বলেছিলাম, নেট তো তৃতীয় বিশ্বে থেকেও নেই। যেখানে উপায় আছে নেটে পৌঁছনোর সেখানেও নেই, কারণ, নেটে সাইট যাদের, যারা ওয়েব পেজ লেখে, তাদের জীবনযাপনটা ঘটে অন্য ভাষায়, দূরত্বটা শুধু বাংলা আর ইংরিজির নয়, দূরত্বটা সংস্কৃতির, ইয়ার্কির, পিছনে লাগার, মূল্য বিচারের, সবকিছুর। তাই সেই অর্থেও একটু দায়িত্ব থাকে বৈকি, অন্তত একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখার।

এর পরেও যদি আপনাদের কারো আর একটু জানতে ইচ্ছে করে, যোগাযোগ করতে পারেন, বুঝি-না-বুঝি, অনেক কিছুই নামিয়ে রেখেছি বা যোগাড় করে রেখেছি, যা নেটে পাওয়া যায়। কিন্তু, দেখুন, আমি বেজায় আস্তিক, ক্রমহ্রাসমান ত্রাসে মেনে থাকি সরকার আইন এবং ভগবানকে, তাই কোনো কিছুই আপনাকে সিডিতে লিখে দিতে পারব না, জীবনে কখনো আইন ভাঙিনি কিনা, কী করব। তবে আমার বাড়িতে বসে যদি পড়তে চান, আমার মেশিনে, কোনো আপত্তি নেই। নিজের বিড়ি নিজে আনবেন, প্লিজ। এই ক্লদ শ্যানন আর বুলির চক্কর নিয়ে বেজায় ভালো একটা পেজ আছে, http://www.cs.ucf.edu/courses/cgs3269/Lecture/notes/Chapter/203-1.pdf। আরো অনেক আছে, এটা পিডিএফে। সুন্দর করে ছবি দিয়ে বোঝানো। তবে দু-একটা ছাপার ভুলও আছে, এই লেখাটার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন।

আমরা বিজ্ঞানপ্রতিভা এবং চ্যাংড়ামির সমান্তরাল চূড়ান্ততার উদাহরণ হিশেবে ফেইনম্যানের কথা জানি। কম্পিউটারের জগতেও তার কমতি নেই। ভন নয়ম্যান বিখ্যাত ছিলেন তার উপশমহীন 'এ' জোকস আর অশ্লীল ছড়ার উদার ভাণ্ডারের জন্যে। ক্লদ শ্যাননের একটা গল্প খুব চলে, বেল ল্যাবরেটরিতে থাকাকালীন তার দুহাতে বল জাগলিং করতে করতে সাইকেল চালানোর। দাবার গেমস, মেজ বা গোলকধাঁধার গেমস, লোকঠকানো মাইন্ড রিডিং গেমস বানানোয় শ্যানন অনেক সময় ব্যয় করেছেন। ক্রিপ্টোগ্রাফি বা সঙ্কেতবিদ্যাকে একটা সিরিয়াস জায়গা দিয়েছিল তার ১৯৪৯-এর প্রবন্ধ 'কমিউনিস্ট থিওরি অফ সিক্রেসি সিস্টেমস'। আসা যাক বুলির গণিতকে কী ভাবে শ্যানন আনলেন আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের জগতে সেই কথায়।

আজকের জগতের সবচেয়ে গতিশীল বিজ্ঞানগুলোর একটা হল ইনফর্মেশন থিয়োরি বা তথ্য-বিজ্ঞান। এই তথ্যবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন শ্যাননের হাতে। যদি কেউ চান, শ্যাননের '৪৮ সালের সেই লেখাটা পড়ে দেখতে পারেন, নেটে দেওয়া আছে, ফ্রি ডাউনলোড করা যায়, http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/paper.html

থেকে, 'এ ম্যাথামেটিকাল থিওরি অফ কমিউনিকেশনস'। শ্যাননের তথ্য-বিজ্ঞান তথ্য বলতে বোঝে শুধু সেইসব চিহ্নের সমাহারকে যাদের মধ্যে অস্তিত্বগত ভাবেই একটা অনিশ্চয়তা আছে। অনিশ্চয়তা এই অর্থে যে সেই চিহ্নটা নিশ্চিত ভাবে কী হবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। ধরুন, আমাদের টেলিগ্রামগুলোকেই, সেখানে 'এ' বা 'দি' এই ইংরিজি আর্টিকলগুলোকে অনেক সময়ই আমরা ইচ্ছেমত বাদ দিয়ে দি, কারণ, খুব সহজেই, নিশ্চিতভাবেই, বুঝে নেওয়া যায়, এখানে কী আসবে। সেই একই ভাবে, একটা বাক্যের মোট শব্দের মোট বর্ণমালা থেকেও অনেক অনাবশ্যক বর্ণকে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তারা নিশ্চিত বলে, এবং তাই অপ্রয়োজনীয় বলে। 'শধ দরকর কথ লখ রখ' — এই কথাটায় 'শুধু দরকারি কথা লিখে রাখো' এই অর্থ বোঝার কোনো অসুবিধে বোধহয় হয়না, স্বরবর্ণগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে বলে। তবে এতে একটা অসুবিধে হতে পারে, ধরুন 'ক' আর 'থ' দিয়ে তৈরি মোট শব্দের সংখ্যা যদি খুব বেশি হয়, এবং সম্ভাব্য শব্দগুলোর মধ্যে 'কথা' ছাড়াও অন্য শব্দ চলে আসে, তখন আর এভাবে মানে বোঝা যাবেনা। অর্থাৎ, তখন আর ওই স্বরবর্ণগুলো অপ্রয়োজনীয় বা নিশ্চিত থাকবেনা।

শ্যাননই আমাদের প্রথম জানিয়েছিলেন যে অনিশ্চয়তাই হল সেই জিনিষ যা আমরা ভাবের আদানপ্রদান বলে বুঝে থাকি। বেশ জবরদস্ত লাগছে না? জীবনের সবচেয়ে গভীর আদানপ্রদানগুলোর সঙ্গে খুব সুগভীর মিল পাচ্ছেন না? অবশ্য সবার অভিজ্ঞতা তো একরকম হয়না। যাইহোক, এখানে আর এসব কপচানো যাবেনা। আমরা কুপথে চলে যাচ্ছি, বুলির গণিত থেকে শ্যাননের ইলেকট্রনিক্সের মূল আলোচনা ছেড়ে।

ক্লদ শ্যানন

বুলির তত্ত্ব মোতাবেক, আমরা কোনো একটা সীমাবদ্ধ এলাকার ভিতর থেকে যখন কোনো নির্বাচন করি তখন সমস্ত সম্ভাব্য পছন্দগুলোকে ব্যবহার করি। ধরুন, একটা পাত্রে সাদা আর কালো দুরকম বল আছে, দুই রঙের বলই আছে দুই সাইজের, ছোট আর বড়। এবার আমাদের বলা হল, 'বড় কালো' বল তুলতে। ভাষাগত ভাবে এই 'বড় কালো' শব্দবন্ধে 'বড়' এবং 'কালো' এই দুটো নিরিখ রয়েছে। এদের দুই ভাবে নেওয়া যেতে পারে — 'বড় এবং কালো', আর 'বড় বা কালো'। বুলির কথা অনুযায়ী আমরা ধরে নেব — 'বড় এবং কালো'। 'বড় AND কালো'।

বিপরীতে, যদি আমাদের বলা হত, 'সব বড় কালো বলকে বাদ দাও', আমরা সেখানেও একাধিকভাবে সমস্যাটাকে দেখতে পারতাম, 'কালো এবং বড়' বল বাদ দাও, বা 'কালো বা বড়' বল বাদ দাও। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যে নিরিখটা খুঁজে নেব তা হল 'কালো কিন্তু বড় নয়' — 'কালো NOT বড়'।

এই দুটো ক্ষেত্রেই আমরা সমস্ত সাদা বলকে বাদ দেব কারণ তারা আমাদের সঠিক নিরিখ নয়। যদি আমরা চাইতাম সমস্ত কালো বল এবং সমস্ত ছোট সাদা বল, তাহলে আমাদের নিরিখটা হত — '(কালো AND বড়) OR (সাদা NOT বড়)'। আমরা যখন ইন্টারনেটে গিয়ে সার্চ মারি, সেটা বুলিয়ান খোঁজা, সেই খোঁজাখুঁজিতেও এইরকম লজিকই ব্যবহার করা হয়। যদি আমরা 'জর্জ AND বুলি' খুঁজি তাহলে ব্রাউজারটা এমন সব পাতা খুঁজবে যেখানে 'জর্জ' আর 'বুলি' দুটো শব্দই আছে। আর যদি আমরা 'জর্জ OR বুলি' খুঁজতাম, তাহলে এমন সমস্ত পাতা খোঁজা হত যেখানে হয় 'জর্জ' বা 'বুলি' এই দুটো শব্দের যে কোনো একটা আছে, মানে হয় 'জর্জ' বা 'বুলি' বা 'জর্জ' এবং 'বুলি' দুটোই।

এবং আমাদের খোঁজার নিরিখটা কী হচ্ছে — খেয়াল করুন — থাকা আর না-থাকা, বাইনারি একটা দ্বিরবস্থা। সত্যি/মিথ্যে, হ্যাঁ/না, ১/০, অন/অফ, খোলা/বন্ধ ইত্যাদি। এর পরে আরো এক রকম লজিক গজিয়েছে — ফাজি

লজিক, কিন্তু ঈশ্বর আমায় ত্রান করুন, আপনারা যা পড়ছেন, এটা লিখতে গিয়ে আমাকে তার বিশগুণ পড়তে হচ্ছে এটা বুঝতে পারছেন? তাতেও তো লাগ-এর তথাগত সঙ্কর্ষণরা নিয়তই ভুল পাচ্ছে — ভাল্লাগে না। এই ফাজি লজিক বা ঘোলাটে যুক্তি আংশিক সত্যি তাই আংশিক মিথ্যেকে খুঁজে নিতে পারে।

বুলির এই লজিক সাঙ্কেতিক বা সিম্বলিক এই অর্থে ধরুন ক বা খ ইত্যাদি চিহ্ন দিয়ে বাস্তব জীবনের কোন বাস্তব বস্তুটাকে বোঝাচ্ছি তাতে কিছু মাথা না-ঘামিয়ে শুধু ক বা খ হিশেবে তাদের নাড়াচাড়া করেই তাদের যুক্তিগত সমস্যার সমাধান করা যায়। এই ক বা খ নামক সঙ্কেতই তার কাজ করার জন্যে যথেষ্ট। ধরুন একটু আগে যখন ক দিয়ে আমরা একটা পলিনোমিয়ালের মান বার করছিলাম, তখন সেটাকে আমরা ডাকতে পারতাম চলরাশি বা ভ্যারিয়েবল বলে। বুলির গণিতে তারা ভ্যারিয়েবল নয়, সিম্বল। এবার ওই সিম্বলগুলোকে নাড়াচাড়া করার, তাদের উপর বিভিন্ন ক্রিয়ার বা অপারেশন করতে পারার বা না-পারার কিছু নিয়ম আছে — সেই নিয়মগুলোকে নিয়েই বুলির গণিত। এই চিহ্নগুলোকে কোনো একটা নির্দিষ্ট মূর্ত বাস্তবতার সাপেক্ষে বোঝানো বা ইন্টারপ্রিট করা যেতেই পারে, যেমন কালো বল বা সাদা বল দিয়ে, এদেরকে এবার কোনো একটা চিহ্ন দিয়ে বোঝানো যেতেই পারে।

কিন্তু এর সঙ্গে চালু বীজগণিতের চলরাশি বা ভ্যারিয়েবলকে গুলিয়ে ফেলবেন না, এটা কিন্তু এমন একটা গণিত যেখানে ১ + ১ = ১ হয়। অন্যান্য বীজগণিতের চলরাশিদের কাছে যা স্যাক্রিলেজ, ভগবানকে গাল দেওয়ার মত পাপ। বুলির এই গণিতে ঠিক আমাদের পরিচিত গণিতের মতই কিছু অপারেশন বা ক্রিয়া আছে, সেই ক্রিয়াগুলো যারা করে তারা অপারেটর। তিনটে প্রাথমিক অপারেটরকে আমরা এইমাত্র আলোচনা করে এলাম — 'AND', 'OR' এবং 'NOT'।

'AND' অপারেটর

বুলির গণিতে 'AND' অপারেটরকে বোঝানো হয় একটা বিন্দু '.' দিয়ে, কিন্তু প্রায়শই এই বিন্দুটা আর লেখার সময় লাগানো হয়না। যা লেখার কথা ছিল 'ক.খ', তাকে লেখা হয় 'কখ'। ক আর খ এই দুটো চিহ্ন বা সিম্বলকে কাজে লাগিয়ে চারটে আলাদা আলাদা সমাহারের সম্ভাবনাকে লেখা যায়।

(১) ক আর খ দুজনেই সত্যি

(২) ক সত্যি কিন্তু খ মিথ্যে

(৩) ক মিথ্যে কিন্তু খ সত্যি

(৪) ক আর খ দুজনেই মিথ্যে

আমাদের কালো আর সাদা বলের উদাহরণ কাজে লাগিয়ে বলা যায়, ধরুন 'ক' বলতে আমরা বোঝালাম, ইন্টারপ্রিট করলাম, কালো হওয়ার ধর্মটা, অর্থাৎ 'ক' মানে কালো। আর 'খ' মানে বড়। এবার 'ক.খ' বা 'কখ' মানে বোঝাবে, এই ক্ষেত্রে — ((কালো হওয়ার ধর্ম) AND (বড় হওয়ার ধর্ম))।

এবার, বুলির গণিত মোতাবেক, যদি দুটো অপারেন্ড বা কর্মের মানই 'সত্যি' হয়, সেই ক্ষেত্রে সর্বমোট মানটাও 'সত্যি' হবে। ধরুন আমরা এবার 'বড় সাদা' বল তুলতে চাইছি, চিহ্নের নিরিখে ক্রিয়াটা হল ক.খ। ক.খ এই ক্রিয়ার সর্বমোট মান হবে —

(১) ক সত্যি (কালো) এবং খ সত্যি (বড়) হলে ক.খ সত্যি (বড় কালো বল)

(২) ক সত্যি (কালো) এবং খ মিথ্যে (ছোট) হলে ক.খ মিথ্যে (ছোট কালো বল)

(৩) ক মিথ্যে (সাদা) এবং খ সত্যি (বড়) হলে ক.খ মিথ্যে (বড় সাদা বল)

(৪) ক মিথ্যে (সাদা) এবং খ মিথ্যে (ছোট) হলে ক.খ মিথ্যে (ছোট সাদা বল)

এর মধ্যে দেখুন 'ক.খ' সত্যি একমাত্র যখন 'ক' সত্যি এবং 'খ' সত্যি। কিন্তু যদি 'ক' মিথ্যে হয়, না-কালো মানে সাদা বলের ক্ষেত্রে, কিম্বা যদি 'খ' মিথ্যে হয়, না-বড় মানে ছোট বল, কিম্বা যদি 'ক' আর 'খ' দুটোই মিথ্যে হয়, না-কালো না-বড় মানে সাদা ছোট বল — এরকম সমস্ত ক্ষেত্রেই ক.খ মিথ্যে হবে। আর একভাবে বললে, 'ক.খ' সত্যি বা এর মান ১ হবে তখনই যখন 'ক' এবং 'খ' দুটোই সত্যি, দুটোরই মান ১।

আর একটু সহজ করে ব্যাপারটাকে লেখা যায় একটা ট্রুথ-টেবল বা সত্যি-টেবিল ব্যবহার করলে। এই সত্যি-টেবিলে দেখুন, আমরা প্রত্যেকটা সারিতে ‘ক’ আর ‘খ’ এই দুইয়ের আলাদা আলাদা মানের জন্যে ‘ক.খ’-র মান দেখিয়েছি।

‘AND’ অপারেটরের সত্যি-টেবিল		
ক	খ	ক.খ
১	১	১
১	০	০
০	১	০
০	০	০

‘OR’ অপারেটর

বুলিয়ান গণিতে ‘OR’ অপারেটরকে লেখা হয় ‘+’ চিহ্ন দিয়ে। এটাকে পাটীগণিতের অভ্যস্ত ‘+’ চিহ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না। আমাদের এই সাদা কালো বড় ছোট বলের উদাহরণটা বড্ড বেশি ক্লাসকনসাস হয়ে গেছে, এবং একটু রূপকথাও, বল থাকে বলবানের, আর বলবান তো সাদা হয়, বড় লোক। তাও, এটাকেই ব্যবহার করা যাক, একবার যখন করে ফেলেছি। ‘ক + খ’ বলতে এবার বোঝাবে ওই বলের পাত্র থেকে সেইসব বলকে তুলে নেওয়া যারা কালো অথবা বড় অথবা কালো এবং বড় দুইই। বুলির গণিত অনুযায়ী, যদি কোনো একটা অপারেন্ড সত্যি হয় বা দুটোই সত্যি হয়, তাহলে সর্বমোট অপারেশনটা সত্যি হবে। এবং, এর মানে, আমরা তুলে নেব সমস্ত কালো বল, তাদের আকার নির্বিশেষে, বড় আর ছোট দুই-ই, আর বড় সাদা বলগুলোকে। পাত্রে অবশিষ্ট থাকবে শুধু ছোট সাদা বলগুলো। এবং এই গণিতে দেখুন, ১ + ১ = ১। আমরা এর কথায় আসছি। একটু বাদেই।

‘OR’ অপারেটরের সত্যি-টেবিল		
ক	খ	ক + খ
১	১	১
১	০	১
০	১	১
০	০	০

‘NOT’ অপারেটর

আগের দুটো অপারেটর ‘AND’ এবং ‘OR’ এই দুটো অপারেশনেই অপারেন্ড-এর সংখ্যা দুই। কিন্তু ‘NOT’ অপারেটর কাজ করে একটিমাত্র অপারেন্ড-এর উপর। যে অপারেন্ডকে নাকচ করে বা উল্টে দেয় এই ‘NOT’ অপারেটর। বা, আর এক ভাবে বললে, সত্যি অপারেন্ডকে মিথ্যে করে, বা মিথ্যেকে সত্যি করে। ‘ক’-এর ‘NOT’ অপারেটর লিখি আমরা ‘ক '’ চিহ্ন দিয়ে। বা, ‘ক’-এর উপরে একটা দাগ দিয়ে,‘$\overline{ক}$’। এখানে আমরা ‘NOT’ অপারেটর-এর সত্যি-টেবিল দেখালাম।

‘NOT’ অপারেটরের সত্যি-টেবিল	
ক	ক '
১	০
০	১

বুলির মৃত্যুর প্রায় আশি বছর বাদে, ক্লদ শ্যানন, শ্যাননের নিজের বিনয়ী ভাষায়, সেই মুহূর্তে 'লজিক আর ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোর সঙ্গেই পরিচয় আছে' এমন এক মাত্র লোক, একে প্রয়োগ করলেন সুইচ সার্কিটের নির্মাণে। শ্যানন তার এই বুলিকে প্রয়োগের কাজ শুরু করেন একটা অ্যানালগ কম্পিউটারে। পরে যা ডিজিটাল কম্পিউটারে লাগানো হয়। অ্যানালগ বলতে কী বোঝায় তা আমরা বলেছি আগে। এই শব্দটা দিয়ে এক ধরনের হিশেব যন্ত্রকে বোঝানোর একটা ইতিহাস আছে।

এখানে অ্যানালগ এই বিশেষণটা বোঝাচ্ছে — একটা সার্কিটের বা ডিভাইসের আউটপুট আর ইনপুট পরস্পর সমানুপাতী। অ্যানালগ শব্দটা এবং আমাদের পরিচিত অ্যানালজি শব্দটা, তুল্যমূল্য তুলনা, এই শব্দ দুটো এসেছে একই প্রকৃতির উপর বিভিন্ন প্রত্যয়ে। অ্যানালগ কম্পিউটারের পিছনে চিন্তাটা এই যে বিচ্ছিন্ন একক আলাদা আলাদা সংখ্যা, যা দিয়ে আমরা এখন ডিজিটাল ক্যালকুলেটর বা কম্পিউটারে অভ্যস্ত — সেই সংখ্যাদের দিয়ে কাজ না-করে, হিশেবটা করছি যে ব্যাপারটাকে বোঝার জন্যে, সেই ভৌত ব্যাপারটারই একটা ছোট্ট ভৌত মডেল বানালাম, প্রতিটি উপাদানের একটা নির্দিষ্ট অনুপাতকে বজায় রেখে। এবার সেই ছোট মডেলটা একটা কম্পিউটার হয়ে কাজ করবে, অ্যানালগ কম্পিউটার, যেখানে একটা ভৌত ইনপুট থেকে ভৌত আউটপুট পাব, শুধু সেটাকে ততগুণ বাড়িয়ে নিতে হবে বাস্তবটাকে পাওয়ার জন্যে, বাস্তব থেকে যতগুণ কমিয়ে আমরা মডেলের ইনপুটটা দিয়েছিলাম।

অনেক অনেক জায়গায় এটা অপরিসীম রকমের জটিল হয়ে পড়বে, ধরুন আপনাকে হিশেব করতে হচ্ছে জনসংখ্যার বদলের হার, আপনার লিলিপুট পুতুলদের দিয়ে জনসংখ্যা বাড়ানোর কাজটা আপনি কতটা করাতে পারবেন আমার সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু সেটা যদি বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থার গ্রিড হয়? নিখুঁত ভাবে সেটাকে বোঝার দরকার পড়ে কারুর, পড়তেই তো পারে? সবাই তো ডব্লুবিএসইবি নয়, যেখানে হিশেব একটাই, বাংলা হিশেব, মফস্বল মরে মরুক, শহরে বিদ্যুৎ দাও, নইলে খবরের কাগজ গালাবে, আর মফস্বলে কী হচ্ছে তাতো কেউই জানেনা। ক্রাইস্ট তো শহরে এসে থেমে গিয়েছেন, ক্রাইস্ট স্টপড অ্যাট ক্যালকাটা, দুটোই 'সি' দিয়ে — এটা যাতে বোঝা না যায়, আমরা আসলে 'সি'-তে প্রিন্স চার্লস আর ক্রাইস্টেরই বাচ্চাকাচ্চা, সেই জন্যেই তো 'কে' দিয়ে করা হল কোলকাতাকে। দেখুন, আবার বাজে বকছি। কিন্তু, যা বলছিলাম, এই ধরনের হিশেবের জন্যে তৈরি ভৌত মডেল, অ্যানালগ কম্পিউটার সত্যিই হত, যেখান থেকে 'অ্যানালগ' এই ধারণাটাই এসেছে। শ্যানন এরকম মেশিনেই কাজ করেছিলেন।

ধরুন ওই বিশালাকার বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থা। তার বিদ্যুৎ প্রবাহ হিশেব করতে হচ্ছে। বেজায় জটিল হিশেব। এখন তো আমরা ডিজিটাল ক্যালকুলেটর বা কম্পিউটার দিয়ে হিশেব করি। এবার, একটা সিচুয়েশন ভাবুন যেখানে সেসব নেই, তাই, একটা মডেল বানানো হল মোট বিদ্যুৎ ব্যবস্থার, অনেক অনেক ছোট আকারে, শুধু অনুপাতটা এক রেখে। অনুপাত মানে সব কিছুরই অনুপাত, গোটা বিদ্যুৎ গ্রিডটার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উপাদানের রোধগত প্রবাহগত বিভবগত, রেজিস্টিভ ক্যাপাসিটিভ ইনডাক্টিভ পরিমাণগুলোর সঙ্গে অনুপাত বজায় রেখে বানানো এই কুচো মডেলটাই এবার গোটা বিদ্যুৎ গ্রিডটার বাস্তব বিদ্যুৎ ব্যবস্থার একটা অ্যানালগ বা তুল্যমূল্য প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়াল।

অনেকটা ছোট মাত্রায় এই মডেলটাই এখন একটা গ্রিড। এবার গ্রিডের যে কোনো একটা ঘটনাকে বোঝানো যাবে এই মডেলটার একটা ছোট মাত্রার ঘটনা দিয়ে। এর প্রত্যেকটা ইনপুট এবং আউটপুট এবার ওই অনুপাতটা বজায় রাখবে। সমানুপাতী হবে পরস্পরের। ধরুন মডেলের ইনপুটটা যদি মূল গ্রিডের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ হয়, আউটপুটটাকেও এক লক্ষ দিয়ে গুণ করে নিতে হবে।

শ্যাননের আমলে ডিজিটাল হিশেবের মেশিন না থাকায় এরকম মেশিন সত্যিই বানানো হত, বিকট বিকট সব অবিশ্বাস্য জটিলতা নিয়েই তৈরি হত মেশিনগুলো। যেমন ১৯২০ নাগাদ ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে বিদ্যুৎ গ্রিডের প্রবাহ মাপার জন্যে তৈরি এসি নেটওয়ার্ক ক্যালকুলেটরটার জন্যে জায়গা লাগত একটা আস্ত ঘর। এই মডেলগুলোই এক একটা অ্যানালগ কম্পিউটার, হিশেব করছে, কম্পিউট করছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার খুঁটিনাটি। ভৌত রকমে তার অঙ্কগুলো কষে দিচ্ছে, আমরা ভৌত ফলাফলটাকে আবার একক দিয়ে সংখ্যার মাপে মেপে নিচ্ছি।

শ্যানন যে অ্যানালগ মেশিনটায় কাজ শুরু করেছিলেন সেটা এর চেয়েও এক কাঠি উপরে, তার নাম ডিফারেনশিয়াল অ্যানালাইজার। অন্য অ্যানালগ কম্পিউটারগুলো যেখানে একটা একক কাজের জন্যেই তৈরি, ডিফারেনশিয়াল অ্যানালাইজার সেখানে একগুচ্ছ বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যার সমাধান করতে পারত, সেভাবেই বানানো — সেই সমস্ত সমস্যা যাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিয়ে হাজির করা যায়। ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কী সেটা যারা জানেন না, ছেড়ে দিন, পরের ব্যাপারটা বোঝার জন্যে এটা কাজে লাগবে না।

এই মেশিনে হিশেবগুলো হত ডেসিমাল বা দশমিক পদ্ধতিতে, বাইনারিতে নয়। আমরা শূন্য নম্বর দিনে ডেসিমাল বাইনারি নিয়ে কথা বলে এসেছি — ডেসিমাল প্রক্রিয়া যেখানে ০ থেকে ৯ এই দশটা ডিজিট বা অঙ্ক দিয়ে সংখ্যাদের বোঝে এবং লেখে, বাইনারি বোঝে ০ আর ১ এই দুটো অঙ্ক দিয়ে। ডেসিমাল ০ মানে বাইনারি ০, ডেসিমাল ১ মানে বাইনারি ১, কিন্তু ডেসিমাল ২ মানে বাইনারি ১০, কারণ, বাইনারিতে আর ডিজিট নেই। এইভাবে ডেসিমাল ৩ মানে বাইনারি ১১, ডেসিমাল ৪ মানে বাইনারি ১০০, ডেসিমাল ৫ মানে বাইনারি ১০১ চলতেই থাকে। কিন্তু মজাটা খেয়াল করুন, মাত্র দুটো জিনিষ লাগছে আপনার বাইনারি প্রক্রিয়ায়। ০ আর ১। বিদ্যুৎ থাকা এবং না-থাকা। বা, একটা বিশেষ ভোল্টের বিদ্যুৎ মানে ০ এবং আর একটা বিশেষ ভোল্টের বিদ্যুৎ মানে ১। ধরুন, আজকের একটা বিশেষ ডিজিটাল কম্পিউটারে তিন ভোল্ট মানে ১ আর আধ ভোল্ট মানে ০। অর্থাৎ অবস্থা মাত্র দুটো। এবার, ওই ডিজিটাল কম্পিউটারের অভ্যন্তরে প্রতিটি সার্কিটাংশেই ৩ ভোল্ট ঢোকা বা বেরোনো মানে ১ ঢোকা বা বেরোনো, এবং ০.৫ ভোল্ট ঢোকা বা বেরোনো মানে ০ ঢোকা বা বেরোনো। গোটা বাস-ব্যবস্থা বা কম্পিউটারের ভিতরের তথ্য চলাচল হাইওয়েতেও ওই একই বন্দোবস্ত কায়েম থাকবে।

কিন্তু শ্যাননের ওই ঘটোৎকচে এসব ছিলনা। সে কাজ করত ডেসিমালে। এবং স্লাইড রুল বা ডায়ালের ঘড়ি যেমন পরিমাপ একক দিয়ে কাজ করে, ইঞ্চি বা ডিগ্রিতে, সেইরকম এই মেশিনে সংখ্যাদের হাজির করা হত নড়া এবং দূরত্ব, মুভমেন্ট এবং ডিসটান্স, দিয়ে। একটা ডান্ডা কতটা নড়ছে তাই দিয়ে বিভিন্ন ভ্যারিয়েবল বা চলরাশিদের হাজির করা হত। গিয়ার দিয়ে গুণ আর ভাগ করা হত। আর বিভিন্ন গিয়ারের পরিমাপের পার্থক্য দিয়ে যোগ আর বিয়োগ করা হত। আঠারোখানা আলাদা আলাদা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করতে পারত এই মেশিন। আর ইন্টিগ্রেশন করা হত একটা গোল এবং ঘোরানো যায় এমন টেবিলের উপর পরিবর্তনীয় ব্যাসার্দ্ধে ঘুরতে থাকা একটা তীক্ষ্ণ খাঁজকাটা ঘূর্ণ্যমান চাকতি দিয়ে। যারা ক্যালকুলাস জানেন না, এই ইন্টিগ্রেশন ব্যাপারটাও বুঝলেন না, ছেড়ে দিন, কোনো ক্ষতি নেই।

চার্লস ব্যাবেজ এর প্রায় এক শতাব্দী আগে তার ডিফারেন্স ইঞ্জিনে শক্তি যোগানোর কথা ভেবেছিলেন স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে, আর ডিফারেনশিয়াল অ্যানালাইজারে শক্তি যোগাত বিদ্যুৎ। ওই ডান্ডাগুলো নাড়ানো আর গিয়ার আর চাকাগুলো নড়ানো — এটাই কাজ ছিল বিদ্যুতের। হিশেবের কাজ করত মেশিনের ভৌত শরীরটা।

প্রতিটি নতুন হিশেবের জন্যে ডিফারেনশিয়াল অ্যানালাইজারের গিয়ারগুলোকে নতুন করে হাতে করে ঠিক জায়গায় এনে দিতে হত। শ্যানন এই ডিফারেনশিয়াল অ্যানালাইজারের এই কাজগুলো করছিলেন আর একই সঙ্গে মেশিনের কাজ করার যুক্তিবিজ্ঞানগত কাঠামো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছিলেন। এই দুটো এক সঙ্গে করাটাই হল সময়ের সেই নতুন মোচড় যা পুরোনো সময়ের গোপন ভাঁজগুলোকে তার চোখে ফুটিয়ে তুলল। শ্যানন ভাবলেন, এই বিশুদ্ধ ভৌত রকমে হিশেব করার প্রক্রিয়াটা যদি বদলে ফেলা করা যায় হিশেব করার একটা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায়, ভৌত অংশগুলোকে নানা প্রকারের বৈদ্যুতিক সার্কিটে বদলে ফেলে? আর কী ভাবে বানানো বা সাজানো হবে সার্কিটগুলোকে? কেন, সঙ্গে আছে জর্জ বুলি, কোমর বেঁধেছে।

১৯৩৭-এ শ্যানন তার গবেষণা সম্পূর্ণ করেন, এবং পরের বছর এর উপর একটা পেপার লেখেন, এ সিম্বলিক অ্যানালিসিস অফ রিলে অ্যান্ড সুইচিং সার্কিটস। যাতে তিনি বুঝিয়েছেন কেমন করে লজিক সার্কিট বানাতে হয়। পেপারটা পাতে পড়ার আগে থেকেই সেনসেশন হয়ে যায় এবং দম ফেলার আগে থেকেই সেখান থেকে নতুন ধরনের ডিজাইন তৈরির প্রকৌশল বানানোর চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। এখানে আর একটা লোকের আর তার কাজের উল্লেখ ভয়ানক দরকার, ১৯৩৬-এ বেরিয়েছিল অ্যালান টুরিং-এর সেই ডাকিনীমন্ত্রের মত শক্তিশালী বৈপ্লবিক বৈদ্যুতিক তত্ত্ব যা গোটা সাইবার চিন্তার প্রকরণটাকেই বদলে দিয়েছিল।

কিন্তু, বিশ্বাস করুন, মাইরি বলছি, আমার আর দম নেই, আজ সাতাশে নভেম্বর, ঠ্যাং প্লাস্টারের চোদ্দ নম্বর দিন। এই কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে এই ধুমকিতে আমি রোজ কম করে ষোল ঘন্টা করে কাজ করেছি, একদিন সাড়ে উনিশ, আর তার মধ্যে এত এত নেট থেকে জিনিষ নামাতে হয়েছে যে পরের টেলিফোন বিলটা আসার পরে মানু যদি আমায় লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেয়, প্লাস্টারে লাগানো হিলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতেই আমার ওকে নৈতিক সমর্থন জানাতে হবে, যেটা আরো করুণ, গালাগাল করার আরামও যখন থাকেনা।

কী ভাবে টুরিংটা লিখব সেটা ছকেও ফেলেছিলাম, ফর্মাল সিস্টেমটা বেজায় উত্তেজনার জিনিষ, একটা বিকট জান্তব বই আছে, 'গেডেল এশার বাক', এরউইন হফস্ট্যাডটের-এর লেখা। যদি কোথাও পান, চোখের পাতা না-ফেলে ঝেড়ে দেবেন, অনেকদিন পাওয়া যাচ্ছেনা। কিন্তু আমার আর এনার্জি নেই। বাড়িটা নাকি পান-বিড়ির দোকান করে ফেলেছি, 'বাবুজি' এবং বাবুজি-জাতীয় গোটা পাঁচেক গান বলির মুহূর্তে পাঁঠার ডাকের স্কেলে বেজে চলেছে, যাদের বিপিএম মানে বিট পার মিনিট একশো তো ছাই বোধহয় দুশোর উপর, যাতে বেসাল মেটাবলিক রেট নেমে না যায়, নইলে অতক্ষণ কাজ করা যায়না। আমি নয় লিখছি, কিন্তু বাড়ির অন্যদের উপরে এবার রহম খাওয়ার দরকার, তাই টুরিং ছেড়ে দিলাম, এই দিনের আলোচনাটা যদি আপনাদের ভালো লাগে মেল করবেন, পরে নাহয় করা যাবে। আর, সরাসরি এর পরের দিন কম্পিউটার প্রজন্মের আলোচনায় যেতে, বা তার পরে গ্নু-লিনাক্স কাঠামোয়, টুরিং দরকারও পড়বে না।

শ্যানন চাইলেন বুলির গণিতের ওই 'AND', 'OR' এবং 'NOT' অপারেশনগুলোকে বৈদ্যুতিক সার্কিটে নিয়ে আসতে। এইজন্যে তাকে রিলের মধ্যেকার বিদ্যুৎ সংযোগগুলোকে কিছুটা বদলে নিতে হল — এখন থেকে তারা হয় বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটতে দেবে — মানে সত্যি মানে হ্যাঁ মানে ১, অথবা বিদ্যুৎ-পথটা কেটে দেবে — মানে মিথ্যে মানে না মানে ০। এই বদলে নেওয়া রিলেগুলোয় এবার বিদ্যুৎ পাঠানো হবে, এতে হয় সার্কিট সম্পূর্ণ হবে, হবে বিদ্যুৎময় মানে শাট বা বন্ধ। অথবা বিদ্যুৎপথ বন্ধ থাকায় সার্কিট থাকবে বিদ্যুৎবিহীন, অসম্পূর্ণ, ওপন বা খোলা। ছবিতে দেখুন এই সময়ের রিলে সার্কিটের কানেকশনটা আমরা দেখালাম, বুলির গণিতের 'AND' অপারেটরের জন্যে।
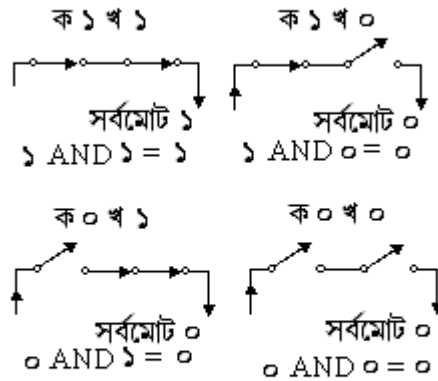
ছবিতে দেখুন, সার্কিট যখন সম্পূর্ণ থাকছে, তখন বিদ্যুৎ যাচ্ছে এবং আমরা পাচ্ছি ১, মানে হ্যাঁ মানে সত্যি। ধরুন একটা বাল্ব যদি লাগানো থাকত এই সার্কিটে তাহলে সেটা জ্বলে উঠত। মানে ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে আমরা সেই বাইনারি গণিতকে হাজির করতে পারলাম যার উপর দাঁড়িয়ে আছে কম্পিউটারের গোটা কাজটাই। কারণ আগেই তো বলেছি, শূন্য নম্বর দিনে, তথ্য মানেই ০ বা ১, সে আঙ্কিক তথ্যই হোক, বা অনাঙ্কিক, আর তাদের উপর কাজের গোটা কাঠামোটাই খুব সরল কিছু পাটীগণিত, যাদের মিলিয়ে মিলিয়ে তৈরি হয় জটিলতর কাজগুলো।

এই ছবিতে একটা ক্রিয়াকে দেখলাম, বুলির তৈরি ‘AND’ গণিত শ্যানন কী ভাবে হাজির করলেন ইলেকট্রনিক্সে, এবার ওই একই ছবি ‘OR’ অপারেশনের জন্যে।

দুটো ছবিতেই একই ভাবে একটা উর্ধমুখী তীর দিয়ে খোলা বা কাটা সার্কিটকে বোঝানো হয়েছে, আর সোজা ডানদিকে তীর দিয়ে আস্ত সার্কিটকে, যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাচ্ছে। এটা জাস্ট শুরু, বুঝতেই পারছেন, সবচেয়ে সরল সহজ প্রাথমিক আঙ্কিক ক্রিয়া, এবং ইলেকট্রনিক সার্কিটে তার প্রতিনিধিত্ব। কী করে গণিতের সমস্যাগুলোকে চালান করে দেওয়া শুরু হল ইলেকট্রনিক সার্কিটে। এবার, অন্তত, শূন্য থেকে এই তিন অব্দি লেখা তথ্য পাঠানোর ভৌত প্রকরণটা আপনি বুঝতে না-পারলেও একটা আলগা ভাসাভাসা ভাবনা তৈরি করে নিতে পারবেন।
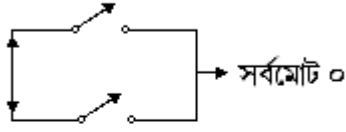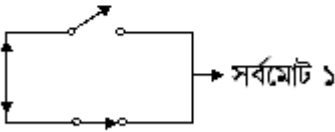
এর একটা চমৎকার ছবি আছে আইবিএম-এর নিজের সাইটে, এখনকার একটা মাইক্রোচিপে ঠিক এই কাজটা করার জন্যে চিপের যে জায়গাটা নির্দিষ্ট তার বহু বহু গুণ বড় করে, কিন্তু কপিরাইটেড ছবি, দেওয়া যাবেনা। যাকগে, এখান থেকেই ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের এবং আমাদের আজকের দিনের শেষ।

এবার, পরের চার নম্বর দিন থেকে আমরা ঢুকব আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের ইতিহাসে। এই অংশের রেফারেন্স অনেকগুলো সাইটের নাম আর বইয়ের নাম তো লেখার মধ্যেই দেওয়া আছে। আর গণিতের ইতিহাসের সমরেন্দ্রনাথ সেনের বিজ্ঞানের ইতিহাস একটা বিপুল বই, যদি নাও পড়েন, কিনে রাখবেন, বংশ উদ্ধার হয়ে যাবে।

আর ভারতীয় ইতিহাসের সংখ্যার প্রাচীনতম ইতিহাসের একটা খুব ভালো বই ভারি সাম্প্রতিক, আসকো পার্পোলার ডিসাইফারিং ইনডাস স্ক্রিপ্ট্স, সেটা মূলত সিন্ধু প্রত্নতত্ত্বের বই কিন্তু এত ধনাঢ্য যে আমি গত তিন বচ্ছর পোস্টমডার্নিজম থেকে পাঁপর অব্দি যত্রতত্র সেটা থেকে ঝেড়ে আসছি, আরো প্রচুর ঝাড়ব।

আর একটা কথা, আজকের গোটা আলোচনাটা মূলত দু জনের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষত আজকের প্রথম সেকশন এবং পরের চার নম্বর দিনের প্রায় সমস্ত ছবি নেটে এদের সাইট থেকে নেওয়া, এদের দুজনের কাছে, আরো অনেকের মত, চিঠি লিখে অনুমতি চেয়েছিলাম, এই দুজনেই উষ্ণ সম্মতি দিয়েছেন। হাওয়ার্ড রাইনগোল্ড। তার বই, দি ফুড ফর থট, নেটেই দেওয়া আছে, সাইট http://www.rheingold.com/texts/tft/1.html।

আর টনি অডসলে, তার সাইট, দি কম্পিউটার হাট, http://www.arcula.demon.co.uk/entry.htm। মানে, এই সিরিজের বিপুল সংখ্যক লেখকের মধ্যে এরাও যোগ হয়ে গেলেন।

ও, অঙ্কের ইতিহাসের সেই সাইটটা, লিংকটা পেয়ে গেছি, পুরোনো একটা ব্যাকআপে প্রথম এইচটিএমএলটা ছিল, http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Indexes/Hist_Topics_alph.html। গিয়ে দেখুন, মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

সংকলন ও রচনা : মধ্যমগ্রাম জিএলটি-র (glt-mad@ilug-cal.org) তরফে ত্রিদিব সেনগুপ্ত